শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ ১ ॥

সারারাত ঘুমুতে পারলো না অনিন্দ্য। প্রথটা বিছানায় ছটফট করতে লাগলো। তারপর ঘামতে শুরু করলো। বিছানা বালিস ঘামে সপ্ সপ করে উঠলো। ঘরের গুমোটে ভাবটা যেন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। একটুও হাওয়া নেই। এতোটুকুটুকু জানালা। তাও আবার দুটোর বেশি নয়। যতোবার তার চোখের পাতা বুজে আসে ঠিক ততোবারই সে দেখলো তাদের সেই ছোট ঘরটার দেয়ালে মেঝেতে আর তাব বিছানা-বালিসে কারা সেই খবরেকাগজ লেপে দিয়ে গেছে। খবরেকাগজের গায় চাইনিজইংকে ঘন করে লেখা—অন্ন বস্ত্র খাদ্যের সংকট! আপনারা দলে দলে যোগদান করুন। আজ চারটেয় বিরাট জনসভা! আপনারা দলে দলে যোগদান করুন। রীতিমত হাঁপিযে উঠলো সে। ঘরটার এতোটুকু জায়গায় সামান্য একটু ফাঁক পর্যন্ত নেই। আজ সকালেই তো সে রাস্তায় দেখেছিলো— কারা সব দেয়ালে দেয়ালে আর ল্যাম্পপোস্টের গায়ে এঁটে দিয়ে গেছে ওইসব লেখা কাগজগুলো। বাবাতো ওই পাশটায় জানালার ধারেই শুয়েছিলো। আর ছোড়দিতো ওই কোণটায়। কাউকে সে দখতে পাচ্ছে না। খালি ঘরের সবটুকু জুড়ে ওই কাগজগুলো।

সে আবার স্পষ্ট পড়লো—আপনারা দলে দলে যোগদান করুন। ঘন কালো কালির লেখা। অনিন্দ্য আবার পাশ ফিরলো। না! ঘুম তার চোখে নামবে না আজ আর কিছুতেই। কোথা থেকে কি বিগ্ড়ে গেছে। কিন্তু এমন হলো কেন?

এমনিভাবে যখন ঘরে সত্যিই সকালের আলো এসে পড়েছে, তখন অনিন্দ্য ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে আবিষ্কার করলো সে

ভীষণ ঘুমিয়েছে সারাটা রাত। ঘরে কেউ নেই। সে একা। বাইরের রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে কাল সারাটা রাত্তিরের কথা ভাবতে লাগলো। কি হয়েছিলো তার কাল? ঘরের কোথাও তো কাল রাত্তিরের কোনো চিহ্নটি নেই। কোথায় খবরেকাগজের সেসব লেখা। তবে কাল সকালে রাস্তায় যে-কাগজগুলো দেখেছিলো সেগুলো কি সব মিথ্যে! রাস্তায় বেরিয়ে দেখে এলে মন্দ হয় না। সত্যিই সে উঠে দাঁড়ালো চোখ রগড়িয়ে। তারপর একদৌড়ে ছুটলো।

মার চোখ এড়াবার নয়। মা চেঁচিয়ে ওঠে—কি রে মুখ না-ধুয়েই ছুটছিস কোথায়! অনিন্দ্য ততক্ষণে সত্যি সত্যিই রাস্তায়। না! সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কতোগুলো কাগজ এখনো আস্ত আছে। কয়েকখানার মাথার কোণটা বা তলাথেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। তবু সেই ঘন কালো কালির লেখা স্পষ্ট পড়া যায়—আপনারা দলে দলে। দুচারখানা কাগজের মাথায় এখনো স্পষ্ট উজ্জ্বল চক্‌চকে লালকালির হরফে লেখা সংকট! তবু অনিন্দ্য বাঁচলো। যাক্—তবে সকালটাই সত্যি রাত্তিরটা মিথ্যে একেবারে মিথ্যে।

বাড়ি ফিরতেই মা ফের চেপে ধরে, বলি তোর কি হয়েছিলো বলতো? কাল সেই যে বিছানায় পড়লি আর আজ এই এতোখানি বেলায়—কিচ্ছু মুখে দিলিনা পর্যন্ত!

ছোড়দি ঠিক মার পিছনেই ছিলো। অনিন্দ্যের আগেই সে বললে—কি বলবো মা! কাল ওইরকম গরমটা গেছে। আর তারই মধ্যে কেমন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়েছে। আমিতো চোখের পাতাটি পর্যন্ত বুজতে পারিনি। আর আমার পিঠের নিচেই তো তোমার ওই মেঝে। ফেটে একেবার ফুটি ফাটা। ঘুমে চোখ একটু ঢুলে এসেছে আর পাশ ফিরেছি তো ব্যশ। এখনো পিঠটা টন্ টন্ করছে।

অনিন্দ্যও যেন ছোড়দির পিঠের ব্যথাটা অনুভব করলো। সত্যি এমন বিশ্রী ঘরের ওই জায়গাটা। আজ কতোকাল যে ঘরের ওই জায়গাটা অমন ফাটা রয়ে গেছে অনিন্দ্য স্মরণে আনতে পারে না। তবু এটুকু সেও বেশ বুঝতে পারে—কি আর করা যাবে!

এতোটুকু ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে সে বাবা আর ছোড়দি তিনজনে কবে থেকে যে শুয়ে আসছে সে ঠিক মনে করতে পারলে না। আর ছোড়দির ওই এক জিদ। জানালার একধারটা ছেড়ে দেবে বাবাকে। আরেক পাশটা তাকে। তবু যতোটুকু হাওয়া পাওয়া যায়! আর নিজের জন্যে ওই জায়গাটা, সত্যিই এমন অবস্থা জায়গাটার! শুয়ে দেখেছে সে। মনে হবে মাঝে মাঝে যেন একহাত মাটি নিচে নেমে গেছে। ঘুমের ঘোরে মনে হবে যেন তলায় তলিয়ে যাচ্ছি।

অনিন্দ্য শুধু ভালো করে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলো ছোড়দির মুখের দিকে কিছুক্ষণ।

ছোড়দি হেসে বললে—আমার দিকে চেয়ে কি গবেষণা হচ্ছে শুনি? এখনো ক্ষিদে পেয়েছে না পায়নি?

হাসলে ছোড়দিকে বরাবরই ভালো দেখায়। অস্বাভাবিক সুন্দর দেখায় এটা লক্ষ্য করেছে সে। তবু ছোড়দির চোখের দিকে তাকালে তার মনে হয় ও-দুটো চোখে কান্না ছাড়া আর কিছু নেই। ছোড়দি জোর করে হাসতেও পারে, কিন্তু কান্নাটা তার খুব সহজেই আসে। কিছু না-বলে আস্তে আস্তে সরে গেলো সে তাদের সামনে থেকে।

আজ তার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে নিশ্চয়। আর তাছাড়া স্কুলের পড়াও তার হয়নি মোটে। সে ভাবলে মনে মনে আজ আর স্কুলে না-গেলে কি হয়।

॥ ২ ॥

স্কুলের সামনে এসে অনিন্দ্য দেখে সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। স্কুলের ফটক দুহাতে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে দারোয়ান। আর তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে হেডমাষ্টারমশায়ের বিপুল শরীর। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি রাগে একেবারে গিস্ গিস্ করছেন। আর হেডমাষ্টারমশায়ের পাশে তার বাবা। তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে কি বলছে কিচ্ছুটি শোনা যাচ্ছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে হেডমাষ্টারমশায়কে সাহায্য করতে প্রায় সব মাষ্টারমশায়রা হন্তদন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। ভেতরের ছেলেরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যারা বাইরে আসবার চেষ্টা করছে তারা হেডমাষ্টার-মশায়ের ধমকে এক্কেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আর বাইরে তো কথাই নেই! স্কুলের সামনে রাস্তাটায় বেশ ছোটখাটো একটা ভিড়। বেশির ভাগই স্কুলের ছেলে। তাদের সঙ্গে আরো নানান ধরনের লোক।

অনিন্দ্যের সমস্ত শরীরে বেশ একটু শিহরণ লেগেছে বলতেহয় বইকি।

ভেতরে যাবার নামগন্ধটি নেই তার। বাবা তাকে দেখতে পেলেও সে এমন ভাবখানা করে আছে যেন সে বাবাকে দেখতে পায়নি। বাঁশের মাথায় কাপড় টাঙানো। লাল টক্‌টকে কাপড়। ছোড়দির মতন একটি মেয়ে একপাশের একটি খুঁটি ধরে আছে। আর নিপুর মেজদার মতন একজন ধরে আছে আরেকটা। নিপুর মেজদাকে বেশ লাগে তার। খুব ভালো লাগে। লম্বা পাতলা, রুক্ষ চুলগুলো মস্ত বড় বড় আর চশমার মধ্যে চোখদুটো সব সময় ঝকঝকে। সে দেখলো লাল কাপড়ের মাথায় বড় বড় সাদা হরফে লেখা :

অন্ন চাই বস্ত্র চাই শিক্ষা চাই

বাঃ! বেশ তো। সে বার তিনচার আওড়ালে। মুখস্থ হয়ে গেলো।

বহুদিন আগে একবার সার্কাস দেখার সময়ে তার মনের ভাবটা অনেকটা এরকম হয়েছিলো। প্রথমটা ভয়-ভয় মেশানো কেমন একটা উত্তেজনা। তারপর সেই ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেলে অদ্ভুত একটা মজার আনন্দ। তার পরিষ্কার মনে আছে মস্তবড় একটা কামানের মুখ থেকে জ্বলন্ত গোলার সঙ্গে বেরিয়ে এলো জলজ্যান্ত একটা মানুষ। আশ্চর্য! মানুষটার মাথাটা গিয়ে ঠেকলো সার্কাসের তাঁবুর মাথায়। তারপর চোখের নিমেষে সেই লোকটা এসে পড়লো নিচে একটা ছোট্ট জালের মধ্যে। অন্য কোথাও পড়লেই হয়েছিলো আর কি। ভয়ে উত্তেজনায় ফুর্তিতে সে পাশের একটি লোককে দুহাতে প্রায় আঁকড়ে ধরেছিলো। কিন্তু বেশএকটা মজা লেগেছিলো।

আজো অনেকটা সে-রকম প্রায়। প্রথমে স্কুলের থমথমে চেহারা, তারপরে হেডমাষ্টারমশায়ের ব্যস্তসমস্ত ভাব, অন্যান্য টিচারদেরও। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো তার বাবাকে দেখে। হেডমাষ্টারমশায়ের ভীষণ বাধ্য মনে হলো তাঁকে। অথচ সে নিজে কানে শুনেছে বাবা মাকে বলেছে—আমাদের হেডমাষ্টারের মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক তুমি দেখোনি তাই একথা বলছো—

শেষ পর্যন্ত (তার যতোদূর মনে পড়ে) মার কথা থাকেনি। বাবাকে না-খেয়েই স্কুলে চলে যেতে হয়।

স্কুলের ভেতরে যাই হোক—বাইরের শতাধিক গলার আওয়াজে সে যেন নতুন করে অনুভব করলো তার একার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। সব চেয়ে মজা লাগল তার যখন তার চেয়ে বয়সে অনেক

বড় একটি ছেলে এসে তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—আজ কিছুতেই স্কুলে ঢুকবে না ভাই। বেশ লাগল তার। তাকেও অনুরোধ করছে সবাই তাদের সঙ্গে বাইরে থাকবার জন্যে। বেশ মজা। মন্দ কি। এতোগুলো লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিকটা হৈ-চৈ করার মধ্যেও যেন বেশকিছু সাহসের দরকার হয়—একথা হঠাৎ মনে হল অনিন্দ্যর। তারও প্রয়োজন আছে বাইরে থাকার। এতোগুলো মানুষের সঙ্গে। সত্যি সে গর্ব অনুভব করলো। সে স্কুলের ভেতরে যায় তা কেউ চায় না। মন্দ কি? নাইবা আজ স্কুলে যাওয়া হলো। আর স্কুলের ভেতরে তো ওই অবস্থা। ঠিক যেন কয়েদখানা।

যদি বা মাষ্টারমশায়ের চোখ এড়ালো কেউ তো সাক্ষাৎ যমদূতের মতো ওই দারোয়ানের নাগালের বাইরে যাবার সাধ্য নেই কারো। ছেলেরা ওর নাম দিয়েছিলো রুফ অব দি ওয়ার্ল্ড। সত্যি ও যখন নিচু ক্লাসের ছেলেদের একহাতে মাথার ওপর তুলতো তখন স্কুলের পাঁচিলেরও ওপার থেকে তারা বাইরের রাস্তার সবকিছু দেখতে পেতো।

বাইরের এই এতোগুলো ছেলের চীৎকারে সবাই কেমন মনে মনে ভীত হয়ে উঠেছে স্কুলের ভেতরটায়। দারোয়ান গিরিগোবর্ধনের মতো ভীম পালোয়ানের মুখেও কেমন আশঙ্কার ছায়া। এই বুঝি কিছু একটা হয়ে যায়। মনে মনে না হেসে পারলো না অনিন্দ্য। সে যে কি করবে বা তার কি করা উচিত সে তখনো তা ঠিক করে ফেলতে পারেনি। তবু জায়গাটা ছেড়ে এক পাও নড়তে ইচ্ছে করছে না তার।

এমনি সময় একটি ছোট মেয়ে একটা টিনের বাক্স তার সামনে তুলে ধরে দু তিনবার ঝম্ ঝম্ করে বাজালো। অনেকগুলো

খুচরো পয়সার আওয়াজ। দেখতে না-দেখতে সে পাশেই আরেকটি বড় মতো মেয়ের সামনে ঠিক আগেকার ভঙ্গিতে আওয়াজ তুললো সেই টিনের বাক্সটা থেকে। সে দেখলো মেয়েটি তার হাতের একটা বড় ব্যাগ থেকে দুটো আনি ফেলে দিলে সেই বাক্সটায়। ছোট মেয়েটি তখন আরো এগিয়ে গেছে। আরেকটি লম্বামতো ছেলের সামনে তুলে ধরেছে তার সেই টিনের বাক্সটা। অনিন্দ্য তাড়াতাড়ি তার পকেট হাঁতড়িয়ে খুঁজে বার করলো একটা আনি। বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেছে তখন মেয়েটি। সে একবার ভাবলো হারিয়ে গেলো নাকি ভিড়ের মধ্যে। নাঃ! ওই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে তার বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলে আনিটা। কিছুক্ষণ আগেও ভেবেছিলো ওটা দিয়ে সে চীনেবাদাম কিনে খেতে খেতে বাড়ি যাবে। মেয়েটির মুখের দিকে এবার স্পষ্ট তাকালো সে। চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বেশ লাগলো মেয়েটিকে। গায়ে আধময়লা একটা ফ্রক আর পায়ে বহুমলিন চটি একজোড়া। তবু এতোটুকু লজ্জা নেই তার, সঙ্কোচ নেই। যেন এ-ভিড়ের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে সে চেনে। প্রতিটি লোক যেন তার আগে থেকে জানা। কেউ দিচ্ছে বা কেউ দিচ্ছে না তবু ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে সে তার হাতের বাক্স তুলে ধরছে উঁচু করে সকলের সামনে। বাঃ বেশ কাজ তো মেয়েটির। সারাটা দুপুর বুঝি এই করছে। বেশ কাজ পেয়েছে তো। মানুষে যে এমন কাজ পায় সে আগে জানতো না। তার ওপর আবার এরকম ছোট মেয়ে।

অনিন্দ্যর এ-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার মনে পড়ে মাসীমার মেয়ে অরুদির কথা। পাড়ার সরস্বতীপুজোয় চাঁদা চাইতে

তার মান খোয়া যায়। তাও তো দামী সিল্কের জামা কাপড় পরে অতি চেনাশোনা লোকেদের বাড়ি যাওয়া। কেমন একটা অহঙ্কারের ভাব। ভারি খারাপ লাগে তার। সে কোনোবার তাই সরস্বতী-পুজোয় ওদের ওখানে যায় না। এমন-কি মা বার বার বললেও না।

আজ মেয়েটির জন্যে সে কেমন একটা ব্যথা অনুভব করলো ঠিক যে-ব্যথা সে ছোড়দির জন্যে বা নিজের জন্যে অনুভব করতো। অনিন্দ্য একসময় বোধ করলো হাতের বইগুলো বড় ভারি ভারি ঠেকছে। সে হাত বদল করলো। যত রাজ্যের ছেঁড়া ছেঁড়া বই জোড়াতালি দেয়া। বয়ে বেড়াতে শুধু লজ্জা করে না, বিশ্রীও লাগে। একবার এ-কাঁধে একবার ও-কাঁধে আবার হাতে, এই করে-করে বয়ে বেড়াও। তবু স্কুলে আসতে হবে আর বইও আনতে হবে। কোনোবার সে নতুন ক্লাসে উঠে আনকোরা নতুন বই হাতে পায়নি। যা দুয়েকখানা চকচকে বই হাতে পেয়েছে তাও অঙ্কের নয়তো বা ভূগোলের। কবিতার নয়। ঝকঝকে চকচকে নতুন একখানা কবিতার বই হাতে করে ধরতেই কেমন অনাস্বাদিত একটা ভালো লাগা তাকে পেয়ে বসে! তবু কবিতার নতুন একখানা বইও সে কখনো হাতে করে ধরতে পারেনি। এটা যেন তার মস্ত বড় একটা ক্ষোভ। এই ক্ষোভটা যখন তাকে আবার পেয়ে বসেছে প্রায়, তখন সে বুঝতে পারলো কেউ একজন পিছন থেকে তার জামা ধরে টানছে। পিছন ফিরতেই দেখে দিপু।

দিপু তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—চল লাইন মারি। এখন মোটে দুটো। টিকিট পাওয়া যাবে। হাইক্লাস বই মাইরি, কি বলব! বিশ্ববন্ধু কাল দেখে এসেছে। কি হবে আর এখানে থেকে বাবা—স্কুল তো আজ আর হচ্ছে না।

অনিন্দ্য চট করে কিছু বলতে পারলো না। সব কিছু মিলিয়ে তখনো তার মনে কিসের ঘোর লেগে ছিলো।

দিপু আবার বললে—তোর কাছে আনা ছয়েক হবে তো!

এইবার যেন দিপুর কথা কানে গেলো তার। সে বললো, পয়সা? একটা আনি ছিলো এইমাত্র দিয়ে দিয়েছি।

সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। যাক দিপু আর তাকে নিশ্চয়ই অনুরোধ করবে না।

দিপু হারবার ছেলে নয়। সে বললো—পুরো একটা আনি দিয়ে দিলি? চীনেবাদামও তো খাওয়া যেতো। কাকে দিলি রে?

অনিন্দ্য একটু বিরক্ত হল। কোনরকমে এক কথায় সেরে দিলে—ওই ওদের টিনের বাক্সে—

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দিপু এবার সত্যিই একটু দমে গেল। তার মুখ দেখে মনে হয় তার জিজ্ঞাসা করাটাই যেন ভীষণ অন্যায় হয়েছে।

বায়োস্কোপ অনিন্দ্য অনেকদিন হল দেখেনি। আর কেমন যেন ভালোও লাগে না তার। কি-রকম একটা বিতৃষ্ণা। অথচ তার বন্ধুদের অনেকেই বায়োস্কোপ বলতে পাগল। এমন কি বন্ধুদের কেউ পয়সা খরচ করে নিয়ে গেলেও সে যেতে চায় না। এ জন্যে তার নিজের দুঃখও কম নয়। আর তার মনের এই গোপন দুঃখের সান্ত্বনা সে কোথা থেকেও পায় না। কেন তার এতো দুঃখ—একথা সে যতোবার বসে বসে ভেবেছে সে দেখেছে তার দুঃখ ভীষণ বেড়ে গেছে। তবু সে তাড়াতাড়ি কোনো কিছুতে খুশি হতেও পারেনি। কেন তা সে আজও পর্যন্ত জানে না।

আবার তার ফিরে মনে পড়ে অরুদিদের কথা। প্রায় বছর

খানেক আগে সে আর ছোড়দি অরুদিদের সঙ্গে বায়াস্কোপ দেখতে গিয়েছিলো। কিন্তু আজো স্পষ্ট মনে আছে তার ভালো লাগেনি, একটুও না। এতোটুকুও না। ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছবি দেখতে দেখতে সবাই মিনিটে মিনিটে হো-হো করে হেসে উঠে-ছিলো। ছোড়দির ওপাশে অরুদি তো একেবারে হাসির দমকে কেঁপে উঠছিলো। ছোড়দিও হেসেছিলো। শুধু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল অনিন্দ্য। সবাই যখন হাসছে সে শুধু অন্যমনস্ক গম্ভীর। তার দিকে অবাক হয়ে কেউ তাকিয়ে নেই তো? সে একবার পিছনে আর পাশটায় চোখ বুলিয়ে নিলে। না। সবায়ের চোখ ছবির দিকে।

ছবিতে তুষারের মত সাদা ধবধবে বাড়িগুলো যখন ফিরে ফিরে আসছিলো তখন নিজেদের ছোট্ট বিচ্ছিরি বাড়িটার কথা ভেবে তার মনটা অজ্ঞাতে কেমন বিষণ্ন আর ভারি হয়ে উঠছিলো। কি সুন্দর বাড়িগুলো। ছাদগুলো মনে হয় আকাশে গিয়ে ঠেকছে। আর ওই ছাদের মাথায় দাঁড়িয়ে আকাশের সমস্ত তারাগুলোকে অনায়াসে ছুঁতে পারা যায়। ঘরগুলো কি সুন্দর। আর জানালাগুলো? মস্ত বড় বড়। ওখানে দাঁড়ালে সমস্ত কলকাতা শহরটা বুঝি দেখা যাবে। তার একবার মনে হলো ছবির মধ্যে ঢুকে পড়ে ওই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রাস্তা থেকে কতো উঁচু ওই জানালাটা। ওখানে দাঁড়ালে তলায় রাস্তার মানুষগুলোকে কেমন দেখায় ভাবতে লাগলো সে। কেমন দেখাবে রাস্তাটা? ট্রাম বাস মোটরলরি আর একরাশ লোক। ওপর দিকে তাকালে সাদা গির্জের চূড়ো কিংবা হাওড়া ব্রিজের মাথাটা নিশ্চয় দেখা যাবে। আর তাদের জানালাটা। রাস্তায় বেরিয়ে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। জানালাটা বড়

জোর তার মাথা অবধি পোঁছয়। সত্যি ভারি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলো তার সমস্ত মনটা তাদের বাড়িটার কথা ভেবে।

কোথা দিয়ে সূর্য ওঠে, কোথায় অস্ত যায়, কোনখান থেকে বিষ্টি পড়ে আর কোথা থেকে দিন রাত্তির হয় এ তাদের জানালার সামনে দাঁড়ালেও কেউ জানতে বা বুঝতে পারবে না। ভারি ইচ্ছে তার দেখতে বিষ্টির ফোঁটাগুলো কোথা থেকে নেমে আসে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। এ জানালায় মাথা চেপে শুধু শুনতে পাওয়া যায় রাস্তার ড্রেনের ঝির্-ঝির্ জলশব্দ। আর নয়তো খুব বেশি বিষ্টি হলে দেখতে পাওয়া যাবে গলিতে নোংরা জল জমে গেছে। আকাশ এ জানালা থেকে কতো ওপরে তার সঠিক হিসাব নিতে ইচ্ছে করে তার মাঝে মাঝে ভিজেবর্ষার দিনগুলিতে। আকাশ কি সে-সময় তাদের ঘরখানার চেয়েও অন্ধকার ?

কেবল চোখে পড়বে সামনে তাদেরই মতো একটা ছোট বন্ধ জানালা। কোনোদিন ও-জানালা খোলা দেখেছে বলে মনে পড়েনি তার। উঃ! ওই তো জানালা তাও বারো মাস বন্ধ।

সে অসহ্য বোধ করেছিলো ছবি দেখতে দেখতে। সে একবার ফিস্ ফিস্ করে বলেছিলো—চল না চলে যাই। ভালো লাগছে না আমার একদম।

ছোড়দি গা-টিপে বলেছিলো, কেউ শুনতে না-পায় এমনভাবে—অসভ্যতা করে না। আর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি—তবে এ-কথাও বলেছিলো যে তারও ভালো লাগেনি। তবু সান্ত্বনা পেয়েছিলো সে। ছোড়দিরও ভালো লাগছে না তবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিপুর হাতথেকে রেহাই পেল না সে। একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেলো তাকে দিপু। বেশ লম্বা

একটা লাইন হয়েছে। কোথায় দাঁড়াতে হবে কেমনভাবে, সব দিপু দেখিয়ে দিলে। আবার বায়োস্কোপ! তার মনটা খারাপ হতে লাগলো আস্তে আস্তে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তারপর সে এক সময়ে বুঝতেই পারলো না যে সে কিছু ভাবছে কিনা সত্যি সত্যি!

কখন যে আবার অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে বসেছে টেরই পায়নি। হঠাৎ পর্দার ওপর চোখ পড়তে দেখলে অনেকগুলো ঘোড়া একসঙ্গে ছুটছে। যে ঘোড়াটা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলো সেই ঘোড়াটাই দেখলে আস্তে আস্তে কখন অনেকগুলো ঘোড়াকে পিছনে রেখে সামনে এসে পড়েছে। সে এবার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলো। সে হেলান দিয়ে বসেছিলো সিটে। এবার দেখলে অন্যসব ঘোড়াগুলোকে পিছনে ফেলে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ঘোড়াটা। ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই যেন কৌতুক আছে। আশ্চর্য! যে-ঘোড়াটা প্রথমটায় একেবারে শেষে ছিলো সেইটাই কিনা গেল জিতে। ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে একবার মনে হলো তার সামনে পিছনে পাশে একটিও লোকে নেই—আরো তার মনে হলো সে নিজেই বুঝি ওই ঘোড়াটার পিঠে বসে আছে। সত্যি কথা বলতে কি সে সমস্ত শরীরে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলো। কিসের একটা দুশ্চিন্তা তার কাঁধে চেপেছিলো, সে এখন হাঁফছেড়ে বাঁচলো। ভাবলো মন্দ লাগে না তো মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে ছবি দেখতে। একবার আড়চোখে দেখে নিলে দিপুকে। তার মনে হলো দিপু হারিয়ে গেছে ছবির মধ্যে। এমনি করে আরো কতক্ষণ কাটলো ঠিক খেয়াল নেই তার। হঠাৎ অনুভব করলো দিপু কনুই দিয়ে

তার পেটে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে। সে একটু নড়ে বসলো। অন্ধকার ঘরে দিপুর মুখ ঠিক দেখতে পেলো না। পর্দায় চকিতে আলো এসে পড়লো সে দেখলো দিপু তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসেছে। সে শুনতে পেলো দিপু বলছে—একেই বলে ষ্ট্রাইক। দেখছিস কি বিরাট মিছিল—এর নাম শোভাযাত্রা। লোক দেখেছিস? বাস্‌রে বাস্‌! এইবার জম্‌বে, বুঝলি! দেবে শালা ওই সামনের বাড়িটা উড়িয়ে। খুব ডাঁট নিচ্ছিলো এতক্ষণ!

বলতে বলতে দিপু উত্তেজিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো আর কি। এমনিসময় ঠিক তাদের পিছন থেকেই এক ভদ্রলোক ধমক দিয়ে উঠলেন—এই খোকা আস্তে।

ধমকখেয়ে দিপু চুপ করলো, অনিন্দ্যর মনে হলো সমস্ত ঘরটা জুড়ে কারা যেন অন্ধকারে ভয়ঙ্কর রকমের চেঁচামেচি শুরু করেছে। তারপরই সে বুঝতে পারলো—না, গোলমাল ঘরের ভিতর নয়। পর্দার ওই অনেকগুলো লোক একসঙ্গে কথা বলছে। তারই ভীষণ শব্দে ঘরটা মুখর হয়ে উঠেছে। সে এবার ভালো করে দেখলো দিপু ঠিকই বলেছে।

গিজগিজ করছে লোক। খালি মানুষের মাথা আর মাথা। অসংখ্য মানুষের কালো কালো মাথা। এতোলোক একসঙ্গে কোন দিনও দেখেনি সে আগে। সামনের মস্ত সাদা বাড়িটা মনে হলো তার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। যা চীৎকার করছে লোকগুলো। তার একেকবার মনে হল শুধু ওই চীৎকারের চোটেই দেয়ালগুলো ফেটে যাবে। সে ভাবলে সমস্ত মানুষগুলো যদি ঘুষি পাকায় তো কতোগুলো ঘুষি হয়? গুনতে পারলে না। সত্যিই গোনা যায় না। আর কতো বড় লাইন হয়েছে। চলেছে তো চলেছে। এক

মোড় থেকে আরেক মোড় দেখাই যায় না। ঠিক যেন একটা মস্ত তিমি। সে তিমি মাছের গল্প পড়েছে, শুনেছে। একেকটা তিমি এমন ভীষণ যে তার কাছে আটলান্টিক মহাসাগরও নাকি হাঁটু জল। ছবির ওই অসংখ্য অগুন্তি লোকের মাঝখানে ওই আকাশ-ছোঁয়া বাড়িটাকে তার মনে হলো সত্যি সত্যিই যেন একটা ছোট্ট তাসের বাড়ি। ওই লোকগুলো যদি সবাই একসঙ্গে ফুঁ দেয় তো বাড়িটা চক্ষের নিমেষে তাসের বাড়ির মতোই পড়ে যাবে দেখতে না-দেখতে।

এক সময় মনে পড়ে গেলো স্কুলের সামনের সেই ভিড়টার কথা। মনে পড়ল তার সারাটা দিনের কথা। এখন কোথায় গেল সেই অত-গুলো লোক ? কোথায় গেল সেই মেয়েটি ? তার বাবা নিশ্চয় এতক্ষণে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। লোকগুলো কি এখনো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। সূর্য তো এখন পশ্চিমে। সারাটাদিন অমন গলাফাটা চীৎকার করে ওদের কি এখন ক্ষিদে তেষ্টাও পায়নি। বার বার মনে পড়লো তার সেই মেয়েটির কথা। সে কি এখন বাড়ি ফিরে গেছে সত্যি সত্যি ? না এখনো ঘুরছে তার সেই ছোট্ট টিনের বাক্সটা হাতে নিয়ে। আবার ভাবলো, ভাগ্যে তার পকেটে আনিটা তখনো আস্ত ছিলো। টের পেলো তার বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। আচ্ছা ওই মেয়েটির কি এখনো ক্ষিদে পায়নি ? ক্ষিদে পেলে সে কি খাবে ? চীনেবাদাম চানাচুর কিম্বা মুড়ি। আর চালভাজার কথা মনে এলে অরুদির ছোট বোন মহাশ্বেতার কথা তার মনে আসে।

বিশেষ করে সেই একটা দিনের কথা। সারাদিন ঝপ্ ঝপ্ বিষ্টি পড়ছে। সে বাড়িথেকে বেরোয়নি সারাটা দিনের মধ্যে একবারো। সকাল থেকে বেলা কখন যে দুপুরে গড়িয়ে গেছে বোঝবার উপায়টুকু নেই। খাওয়াদাওয়া সেরে সে একখানা মোটা বই নিয়ে বসেছে,

কোথা থেকে যে বিকেল হয়ে আসছে সে খেয়াল তার নেই। শুধু মাঝে মাঝে বইয়ের পাতার ওপর যখন চোখদুটো টন্ টন্ করে ওঠে তখন শুধু একটু একটু বুঝতে পারে বাইরে আলো আরো কমে আসছে। মন তার বইয়ের পাতার মধ্যে যখন একরকম হারিয়ে গেছে, এমনি সময় হঠাৎ বিষ্টিতে ভিজে জব্ জবে হয়ে মহাশ্বেতা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। তাকে হঠাৎ এরকম অবস্থায় দেখে সে প্রথমটা বেশ একটু ঘাবড়িয়ে গেলো। কি করবে ভেবে পেলো না। শুধু বললে একী! এ যে একেবারে চান করে ফেলেছো।

শ্বেতাদি বললে—আগে চটকরে শুক্‌নো একটা কিছু দে-দিকি—

কি যে দেবে সে ঠিক করতে পারে না।

দে দে তাড়াতাড়ি দে, ভীষণ শীত করছে—তাড়া দিলে শ্বেতাদি।

সত্যিই ও হাতের কাছে কিছু খুঁজে পায় না।

এমনি সময় শ্বেতাদি কোণের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ওটা কি পড়ে রয়েছে, ওইটেই দেনা, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়াতে পারছি না—

ওদিকটায় তার আগেই নজর পড়েছে। ছোড়দির একটা ময়লা ছেঁড়া শাড়ি জড়ো-করা ছিলো। বিষ্টির জন্যে আর কাচা হয়নি। ঘরের মধ্যে দুখানার বেশি তিনখানা কাপড় শুকোনো যায় না। একে ময়লা আর তেমনি ছেঁড়া। লজ্জা করছিলো সত্যি সত্যি ওখানা শ্বেতাদির হাতে দিতে। কিন্তু শ্বেতাদির তাড়া খেয়ে সেখানাই ছুঁড়ে দিলে তার দিকে। হাঁফছেড়ে বাঁচলো যেন শ্বেতাদি। আর ওই ছেঁড়া কাপড়খানাই এমনি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পড়লো যে, সে বুঝতেই পারলো না যে কাপড়খানা অতবেশি ছেঁড়া।

এবার কি করা যায় বল্‌তো, তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো শ্বেতাদি।

চা করো না শ্বেতাদি, উনুনে আগুন আছে, ফস্‌ করে বলে ফেল্‌ল সে।

এই জল-ঝড়ের দিন কেউ আবার দুবার করে আঁচ দেয় নাকি। সে আমি জানি, আমি ভাবছি কি খাওয়া যায়। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে—আর যে ভেজাটা ভিজেছি—

অনিন্দ্য যে কি বলবে ভেবে পায় না। বাইরে বেশ বিষ্টি হচ্ছে। বেরিয়ে যে কিছু আনবে তারও উপায় নেই।

এমনি সময় শ্বেতাদি নিজেই বললে, আচ্ছা চাল আছে তো—

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো অনিন্দ্য। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না হঠাৎ চাল নিয়ে কি করবে এখন শ্বেতাদি।

ব্যস্‌ তুই চুপ করে বসে দেখ আমি কি করি—বলে পাশের আরো ছোট্টো আরো অন্ধকার ঘরটার মধ্যে চলে গেলো শ্বেতাদি।

সেও আর কথাটি না-বলে চুপচাপ বইয়ের পাতায় মন দিলো।

বাইরে বিষ্টি যখন অনেকটা ধরে এসেছে, আর তার মনটাও একটু বই ছাড়ি-ছাড়ি করছে, এমনি সময় শ্বেতাদি এসে ঢুকলো ঘরে। কপালটা বেশ ঘেমে উঠেছে। দুটো বাটি করে কি যেন এনে রাখলে, আর তার সঙ্গে দুকাপ গরম চা।

দেখো এবার কি রকম লাগে, শ্বেতাদি আঁচলটা দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বললে।

কি শ্বেতাদি ?

দেখোই না কি—

সে একটা বাটি কাছে টেনে আনে। আনন্দে লাফিয়ে

উঠতে ইচ্ছে করে তার। তেল নুন আর ঝাল দিয়ে চাল ভেজে এনেছে শ্বেতাদি। সত্যি কি যে বলবে শ্বেতাদিকে সে ভেবে পায়না। মা তো এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে আর ছোড়দিরও টিকিটি নেই। কি করতো সে এমন বাদলার দিনে এ-সময়ে যদি শ্বেতাদি না আসতো।

চা'র সঙ্গে চালভাজা খেতে খেতে তার মনে আসে অরুদিদের ছোট মাসিদের বাগানে চড়ুইভাতির কথা। শ্বেতাদি বলতে গেলে একাই সকলকার রান্না রেঁধেছিলো। ছোড়দিও রেঁধেছিলো বটে, কিন্তু শ্বেতাদি একাই দশজন। রান্নায় কিন্তু ছোড়দি শ্বেতাদির কাছে লাগে না, একথা মনে মনে স্বীকার না-করে পারলো না সে। সত্যিই জাদু জানে শ্বেতাদি। একেক সময় মনে হয় তার।

অরুদি বলেছিলো, সঙ্গে একজন রাঁধুনে বামুন নিয়ে গেলে কেমন হয়?

শ্বেতাদি বাধা দিয়ে বলেছে, না, ওখানে গিয়েও যদি নিজেরা না রাঁধি তো মজা কিসের। কিছু ভয় নেই। সব ভার আমার।

সত্যি সেই আমবাগানের নিচে কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যায় আর কি। তবু নড়ে না শ্বেতাদি। অরুদি সারাটা দিন ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে তুলে বেরিয়েছে। অনিন্দ্য শ্বেতাদির কাছে এসে বললো, চলো ছবি তোলা হবে সবাইকার একসঙ্গে, তুমি যাবে না শ্বেতাদি।

হ্যাঁ আমি রান্না ছেড়ে যাই, আর এদিকে সব—দেখছিস না কাঠের আঁচ, একটু এদিকওদিক হয়েছে তো আর রক্ষে নেই—

সত্যি শ্বেতাদির দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্যর ভারি রাগ হলো

আর সবায়ের ওপর। ধোঁয়ায় বেচারীর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। আর আঁচলটা চেপে আছে সব সময় চোখের ওপর। ছোড়দি তো এদিকে ছবি তোলার নাম শুনে দে ছুট। শ্বেতাদির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, খুব ইচ্ছে করছে তারও ছবি তোলার। সে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে এলো শ্বেতাদিকে, চলো চলো ওদিকে ছবি তোলা শেষ হয়ে এলো, ভারি তো রান্না তোমার—

খেতে খেতে কেউ কেউ যখন রান্নার নিন্দে করতে লাগলো শ্বেতাদি শুধু তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, আমার কিছু দোষ নেই, ওই যে ওকে ধরো, তারপর মাথা নিচু করে মিটমিট করে হাসতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে হাসি পেয়ে গিয়েছিলো তার। সে শ্বেতাদিকে জিজ্ঞাসা না-করে পারেনি, আচ্ছা সেই চড়ুইভাতির কথা তোমার মনে আছে শ্বেতাদি?'

মনে নেই আবার—বলে একচুমুকে বাকি চাটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়ালো শ্বেতাদি। বাইরে বিষ্টি একেবারে ধরে গেছে ইতিমধ্যে। ছোড়দিও এসে পড়েছে।

ঘরে ঢুকেই ছোড়দি চেঁচিয়ে ওঠে—বা! নিজেরা চা-টা খেয়ে বেশ বসে আছো দিব্যি—

হ্যাঁ তোমার জন্যে কাজ রেখেছি—আমার ভিজেকাপড়টা ভালো করে শুকিয়ে পাট করে রাখবে। আর তোমার এই কাপড়টা আমি পড়ে যাচ্ছি—বলে সত্যি সত্যি দরজার বাইরে পা ফেলে শ্বেতাদি।

তার কথায় না হেসে থাকতে পারে না ছোড়দি। অনিন্দ্য শুধু ভাবে, কে বলবে শ্বেতাদি অরুদির বোন।

ছবি শেষ হয়ে গেলো। বাইরে বেরিয়ে এসে অনিন্দ্য দেখলো রোদ আকাশের পশ্চিম গাঁয়ে এসে লেগেছে। এখানে এসেই যেন সে থেমে পড়েছে। আর নড়বে না কোনোদিকে। এখনকার আকাশের চেহারাটা দেখে আলো-রোদ্দুর-মাখা ঝকঝকে সারাটা দিনের কথা তার বার বার মনে পড়ল—কোথা দিয়ে কেটে গেলো আজকের সারাটা সকাল দুপুর। এও তো ঠিক বায়োস্কোপের ছবি। তার মনে হয় একবার পয়সা খরচ করে বায়োস্কোপ না-দেখে আজকের সারাটা দিনের কথা যদি একলাটি চুপি চুপি বসে ভাবা যায় তো আবার একটা ছবিই তো দেখা হয়ে যায়। সত্যিই মনে থাকবে তার আজ সমস্ত দিনটার কথা—সকালের কথা দুপুরের কথা দিপুর সঙ্গে সিনেমার কথা আর এখনকার ওই আকাশটার কথা। সে কোনদিনো ভুলতে পারবে না। কোনদিনো না। এমন সুন্দর রঙের কাপড়ও পাওয়া যায় তবে। অরুদিতো ঠিক এমনি রঙেরই একখানা কাপড় পড়েছিলো সেদিন। তবু ভালো লাগেনি অরুদিকে তার। আশ্চর্য। এমন সুন্দর রঙ। সে যতোবারই তাকায় ওই পশ্চিম দিকটায় চোখ ফেরাতে পারেনা। সারাটা দিন যেন ঘুরে ঘুরে এইখানে এসে পৌঁছাবার প্রতীক্ষায় ছিলো। সূর্যের চারপাশটা ঘিরে আকাশটা অদ্ভুত লালচে হয়ে উঠেছে। মনে হয় হাত দিয়ে ছুঁলেই হাতে ফোস্কা পড়ে যাবে। অথচ তাকিয়ে থাকতে থাকতে নেশা ধরে যাচ্ছে অনিন্দ্যর। অপূর্ব লাল্‌চে সোনা-সোনা রঙ।

একসময়ে দিপুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে সে। কখন বিকেল পড়ে এসেছে। রাস্তায় অন্যদিন এ-সময়ে আরো বেশি লোক দেখেছে সে। রাস্তাঘাট কেমন যেন চুপচাপ অন্যদিনের

তুলনায়। কিছু কিছু দোকানপাটও বন্ধ। হেঁটে যারা চলেছে তাদের অনেকেই ছোটছোট একেকটা দলে কিসের গুঞ্জন করতে করতে যাচ্ছে। তার মনেও কেমন একটা ঔৎসুক্য জেগেছে।

সে এমন একটা ছোট দলের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলা শুরু করলো। ঠিক বুঝতে পারলো না কি নিয়ে কথাবার্তা কইছে তারা। মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলো তবু ধরতে পারলো না ঠিক। আবার দেখলো তার সামনেই জন তিনেক লোক বেশ চড়াগলায় তর্ক করতে করতে চলেছে। সে তাড়াতাড়ি পা-চালিয়ে তাদের পিছনে চলে এল। খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো তাদের পিছনে পিছনে প্রায় অনুসরণ করার ভঙ্গিতে। যদি কিছু শুনতে পায় সে। এবারে একজনের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার তার কানে এলো—এতো জানা কথা রে বাবা। আজ না হয় কাল হবেই। কদিন ঠেকাবে বাবা। তবে শালা এরকম লোক অনেক দিন দেখিনি, লোক দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাইরি।

সে তবু আঁচ করতে পারলো না ব্যাপারটা। তার মনে হলো যতোদুর সম্ভব কোন একটা বড়রকমের গোলমাল বা হাঙ্গামা হয়েছে শহরে। সে মন্থর পায়ে এগিয়ে চললো বাড়ির দিকে। অনেকখানি পথ হেঁটে চলে এসেছে সে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে গেছে। মনটা তার বিষণ্ণ ভারি হয়ে উঠেছে কখন। অমন সুন্দর বিকেলও এখন তার তার কাছে সুন্দর মনে হলো না একটুও, এই যেন কি ছিলো, আর কি হারিয়ে গেলো এই মাত্র।

আস্তে আস্তে পা-টিপে পা-টিপে বাড়ি ঢুকলো সে। ঘরের চৌ-কাঠে পা দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে বার করে নিলো শরীরটাকে বাইরে। ঘর থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। বাবা খুব চীৎকার

করে কথা বলছে। ঘরের মধ্যে নিশ্চয় মাও আছে। ছোড়দিকে সে দেখতেই পেয়েছিলো। মার সামনে আজ কাল বাবা কোনোদিন বিড়ি খায়না। মাকে বলতে শুনেছে বহুবার—কি করে যে ভদ্দরলোক বিড়ি খায় আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমার সামনে কিছুতেই তুমি বিড়ি খেতে পাবে না। আমার দিব্যি যদি বিড়ি খাও—একবার দু'বারে বাবা কথা কানেই তোলেনি। শেষ-কালে মা কিছুতেই ছাড়বে না দেখে বাবা মার সামনে বিড়িখাওয়া ছেড়ে দিলে। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সে সব শুনলো। আজ সকালে কি কি ঘটেছে তারই কথা সবিস্তারে বাবা বলছে মা আর ছোড়দির কাছে। ছোড়দির গলার কোনো আওয়াজই সে পায়নি। মা বেশ একটু ভয়ে ভয়েই বলছে—তা অমন গোলমাল পথেঘাটে জানলে কেই বা ছেলেটাকে বেরুতে দিতো। আর অতবড় ছেলে। বলি, তোর কি একটু জ্ঞানবুদ্ধি নেই। এটুকুও তো বোঝা উচিত আর কেউ না হোক মা ভেবে ভেবে মরবে ?

বাবা বেশ ভারী গলায় হুমকি ছাড়লেন—আর জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তোমার ছেলের। কিছু নেই আছে শুধু লম্বা লম্বা কথা আর হুজুগ। আর কাকেই বা কি বলবো ? যেমন হয়েছে স্কুলের ছেলেগুলো। জেনেশুনে আজ স্কুলে গেছে গোল পাকাতে। আমি কি তোদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসবো যে আজ স্কুলে আসতে হবে না, না স্কুলের ভেতরে দাঁড়িয়ে বলবো তোরা ষ্ট্রাইক কর—নিজের চাকরিটা তো রাখতে হবে। আর ওই হেডমাষ্টার। উনিশ বছর চাকরি করে একদিনও খুশি করতে পারলাম না লোকটাকে। মাইনে তো এক পয়সাও বাড়াবে না, আর তেমনি ভুগিয়ে ভুগিয়ে টাকা দেবে। ঝাঁটা মারো লেখাপড়ার মুখে ঝাঁটা মারো। একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয় যদি

ছেলেগুলোর। আজকালকার ছেলে হয়ে এটুকুও বুঝিস না হতভাগারা—বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না আমাদের। বাবা দম নেবার জন্যে থামলো। অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তার সমস্ত শরীর রী রী করে উঠলো। মনে হলো বাবা যেন আগাগোড়া সাজানো মিথ্যেকথাগুলো মুখস্থ বলে যাচ্ছে। সমস্ত মিথ্যে সমস্ত মিথ্যে। একটুও সত্যি নেই বাবার কথায়। তার ইচ্ছে হলো এক্ষুনি গিয়ে মা আর ছোড়দির কাছে সব কথা ফাঁস করে দেয়। বলে দেয়—বাবা কী রকম ভীতুর মতো হেডমাষ্টার মশায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। কী রকম ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছিলো হেডমাষ্টারের সঙ্গে। কী ভীষণ ভয় পেয়েছিলো বাবা। তার কাছে একটা ক্যামেরা থাকলে সে ছবি তুলে রাখতো বাবার। দেখাতো ছোড়দিকে আর মাকে। তবু সে যা যা ভাবলো তার কিচ্ছুটি করা হলো না। দরজার ফাঁকে অল্প একটু মাথা বাড়াতেই ছোড়দির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো। সে কাতরভাবে ছোড়দিকে ইসারায় ডাকলো। তার যা বলবার অতি সন্তর্পনে ছোড়দিকে ফিস্ ফিস্ করে বললো। ছোড়দি তাকে আশ্বাস দিলো যা করবার সেই করবে! বেশ কিছুক্ষণ তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপরে ধীরে ধীরে সে ছোড়দির সঙ্গে ঘরে ঢুকবে। ছোড়দি মার দিকে তাকিয়ে বলবে—এই যে মা তোমার ছেলে। ধরে এনেছি। ঝুমকোদের বাড়িতে বসে বসে পানুর সঙ্গে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত তাস পিটছিলেন। মা নিশ্চয় হাঁফ ছেড়ে বলবে—যাক বেঁচেছি। রাস্তায় ছিলো না ভাগ্যি। আমি তো ভেবে ভেবে মরছিলুম।

ঘটনাটা ছোড়দি যেমন সাজিয়েছিলো, ঠিক তেমনি ঘটলো দেখে সে যেন বেঁচে গেলো। সবচেয়ে ভয় করে সে বাবার ওই

চেঁচামেচিআর গোলমাল। শুধু ভয় করে না সে ; খুব খারাপ লাগে তার। সে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই বারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তার মনে হলো একবার বাবা কি মনে মনে ভাবছে, সে বাবার সব কথা জানে। এক্ষুনি বলে দেবে মাকে আর ছোড়দিকে।

॥ ৩ ॥

বাড়ির ছোটো বড়ো সব কাজই করতে হয় ছোড়দিকে। তাকে হ্যারিকেনটিও জেলে দিতে হবে। তার বাঁধাধরা অনেক কাজের মধ্যে এও একটা। কতোকাল থেকে অনিন্দ্য দেখে আসছে, ঠিক সন্ধ্যে হয়ে আসবে, বাইরের আলো নিভে আসবে, তাদের ঘরটা খুব বেশি অন্ধকার-অন্ধকার মনে হবে আর সেই সময় ছোড়দি দপ্‌ করে জেলে দেবে হ্যারিকেনের আলোটা। কিছুক্ষণ আগেও কাঁচের চিম্‌নি থেকে কালি তুলছিল যখন অতি সযত্নে ঘষে ঘষে তখনো তার মুখের একপাশটা খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো তার মুখ। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ হ্যারিকেনের আলোয় তার মুখ বেশ উজ্জ্বল মনে হল অনিন্দ্যর। মাথাটা নিচু, চোখ দুটো আলোর শিখার দিকে। মাথার চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো।

এমনি করে অনেক অনেক সন্ধ্যা কেটেছে।

কবে একদিন ছোড়দি বড় হয়ে গেছে। সকালের দুপুরের বিকেলের আলোয় সে কোনোদিনো দেখেনি বোধকরি ছোড়দিকে ভালো করে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন সে হ্যারিকেনের আলো জ্বালতে বসেছে তখনই বুঝি শুধু সে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছে ছোড়-দিকে। যদি সে প্রত্যেকটি সন্ধ্যার অন্ধকারে ভালো করে নজর রাখতো ছোড়দির ওপর তবে সে নিশ্চয় দেখতে পেতো ছোড়দি বড় হচ্চে খুব আস্তে আস্তে যখন চারপাশে এই সন্ধ্যার অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। কেবল সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকার।

অনিন্দ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে এসময়। তবু তাকে বই নিয়ে বসতে

হবে। কতগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া পুরোনো বই। অনেক পাতা এলোমেলো হয়ে গেছে নয়তো বা হারিয়ে গেছে। বইগুলো দেখলেই তার মনে হয় এগুলো সে বহুদিন আগে বহুবার পড়ে ফেলেছে। আর নতুন করে পড়বার দরকার নেই। সমস্ত পাতার লাইনের তলায় দাগকাটা। বইয়ের মাথায় কতোজন যে কতবার নাম লিখে রেখেছে তার ঠিক নেই। তার নিজের নাম লেখবার এতোটুকু জায়গা নেই। সে প্রত্যেকবার ভেবেছে এবারে দুয়েকখানা নতুন বই নিশ্চয় পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেছে বাবা এখান থেকে ওখান থেকে পুরোনো বইগুলো জোগাড় করে এনে দেবে। হ্যারিকেনের আলোয় বইগুলো খুলে ধরলেই চোখ তার জ্বালা জ্বালা করে ওঠে। সে পড়তে পারে না। একটি লাইনও। তার কান্না পায়।

আর ঠিক এই সময়টাতে বাবা ঘরে ঢুকবে। আর একবার চোখ বুলিয়ে নেবে তার ওপর। ভাবতে ভাবতেই বাবা ঘরের মধ্যে এসে পড়লো। গায়ের জামাটা না-খুলেই বাবা মেঝেতে বসে পড়লো ধপ করে। ছোড়দি চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকলো। আর ওই এক চায়ের কাপ। ওটা কি কিছুতেই ভাঙবে না। ভাঙলে তবু একটা নতুন কাপ আসে। কি করে যে বাবা ওই কাপটাতে চা খায়। ওর একেকবার ইচ্ছে হয়েছিলো চুরমার করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে ওটাকে। তারপরেই ভেবেছে না থাক দরকার নেই। সে আলোটা দেয়ালের এক কোণে নিয়ে গিয়ে বাবার দিকে পিঠ করে বসলো।

ঘরের এক পাশটায় আবছা অন্ধকারের মতো হয়ে গেলো। দেয়ালের ছায়া দেখে অনিন্দ্য বুঝলো মা এসে ঢুকেছে ঘরে। বাবা ওঠবার জন্যে ব্যস্ত হতেই, মা চেঁচিয়ে উঠলো—এইতো পা দিলে

বাড়িতে, এরই মধ্যে আবার চললে কোথায় ? আমার কি একটি কথাও কোনোদিন তুমি শুনবে না ? বলে বলে আমার মুখে থুতু উঠে গেলো।

বাবা মার কথা চাপা দিয়ে বললো—কোথাও যাচ্ছি না কোথাও যাচ্ছি না। তুমি এমন করে টিকটিক করলে কি করে কি করি বলোতো ? দাবার আড্ডায় একটু বসবো, যাবো কোথায়।

না টিক টিক করবে না। কতোবার করে বলবো তোমাকে, ছেলে পড়াতে যেতে হবে না। ছেলে পড়িয়ে কি তুমি মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় করবে ? শুধু শুধু শরীরটার মাথা খাওয়া—

মা জানে এ কথাগুলো বলার কোনো অর্থ হয় না। তবু মা বলবে। বলে বেরিয়ে যাবে ঘর থকে। আজো তাই করলো। অনিন্দ্যও জানে মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর বাবাও আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে পা দেবে।

কোথায় যাবে বাবা এখন ? দাবার আড্ডায় ?

তার আজ গোড়াথেকেই পড়ায় মন বসছিলো না। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো আজ একটি বর্ণও পড়তে পারবে না। সে দেখবে বাবা কোথায় যায়। দাবাখেলা মানেতো হরিভূষণ বাবুদের বৈঠকখানায় যাওয়া। হরিকাকাদের বাড়ি সে চেনে। অনেক অনেকদিন সে বাবার খবর নিয়ে ও-বাড়িতে গেছে। কিংবা বাবার ফিরতে দেরী হলে বাবাকে ডাকতে গেছে। আগে আগে বাবাকে ওখানে সে দেখতে পেয়েছে। আজকাল অনেকদিন খোঁজ করতে গিয়ে সে বাবাকে ওখানে পায়নি।

অনিন্দ্য আর বসে না-থেকে উঠে পড়ল। বাবা তাকে লক্ষ্য না

করে এমনভাবেই সে বাবার পিছু নিলো। বাবা অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তার দিকে চোখ নিচু করে হাঁটে। এ-পাশে ও-পাশে সামনে কোথাও তাকাবে না। তার একেকসময় ভয় করে গাড়ি ঘোড়া এলে তো দেখতেও পাবে না। পড়বে একেবারে সামনে। তবু বাবাকে অন্য রকম হাঁটতে দেখেনি অনিন্দ্য। সে চোখ মেলে দেখলো বাবা একটা বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করছে। দেশলায়ের কাঠিটা একবার নিভে গেলো। দুহাতের মুঠোর মধ্যে আবার আরেকটা কাঠির আগুনজ্বালালো সেটাও নিভে গেলো ভীষণ জোরে একটা বাতাস আসতে। ইতিমধ্যে ট্রামলাইনের সামনে এসে পড়েছে। সে ও-ফুটে বাবার কাছ থেকে বেশ কিছুটা তফাতে। একটা ট্রাম এসে পড়েছে। বাবা আরেকবার দেশলাই জ্বেলে বিড়িটা ধরিয়ে নিলো ট্রামটা চলে গেলে ট্রামলাইনটা পার হয়ে গেলো দুদিকে ভালো করে তাকিয়ে। অনিন্দ্যও রাস্তাটা পার হয়ে বাবার উল্টো দিকের ফুটপাথটা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। সে দেখলো বাবা বাঁদিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

গলিটা তার চেনা। এ-গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার দুয়েকখানা বাড়ি আগে তাদের স্কুলের বিশ্ববন্ধুদের বাড়ি। মস্ত বাড়ি। অনেকদিন আগে হঠাৎ স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে সে একদিন দুপুরবেলা এসেছিলো তাদের বাড়িতে। তাই গলিটা তার চেনা। এবার কিন্তু সে একটু মুস্কিলে পড়লো। গলির মধ্যে বাবা যদি তাকে হঠাৎ দেখে ফেলে। বাবা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেও সে তাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো মোড়টায়। বাবা যখন বেশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে সে ঢুকে পড়লো গলিটার মধ্যে। মোড়ের মাথায় একটা গ্যাস। তারপর আরো খানিকটা দূরে একটা। সে-আলোয় স্পষ্ট কিছু চোখে পড়বে না। বাবা

যখন বাঁদিকে আবার ফের বাঁক নিলো সেও একটু জোরে পা চালালো। প্রায় দৌড়ে এসে দেখলো বাবা হাতের বিড়িটা ফেলে দিলো। তারপর কাপড়ের কোঁচাটা দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে বিশ্ববন্ধুদের মস্ত দরজাটার মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেলো। দরজার সামনে জোয়ান গোছের একটা লোক বসে ছিলো। সে উঠে দাঁড়ালো। একটু পরেই সে দেখলো রাস্তার সামনের বড় জানালাটার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ খানিকটা আলো এসে পড়লো অন্ধকার-অন্ধকার জায়গাটায়। বিশ্ববন্ধুদের বৈঠকখানায় আলো জ্বললো। একটা লোক এসে সাদা ধব্‌ধবে পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিলো দুপাশে। এবারে জানালার গরাদের ছায়াগুলো লম্বা লম্বা হয়ে বেঁকে বেঁকে পড়ল রাস্তায়।

এতোক্ষণে সে ঘরের ভিতরটার সবটুকু দেখতে পেলো। সে অবশ্য ইতিমধ্যে জানালার এ-পাশে একটু সরে এসেছে। তার মুখেও জানালার বাইরের আলো এসে লেগেছিলো। এ-পাশের একটা টিউবওয়েলের গা-ঘেঁসে সে দাঁড়ালো। জায়গাটা থেকে ঘরের প্রায় অনেকখানিই বেশ ভালো করে দেখা যায়। সে তাই বাবাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো। বাবা গায়ের আধময়লা চাদরটা খুলে চেয়ারের পিঠে রাখলো। বেশ উঁচু গদি-আঁটা চেয়ার। সামনে ঝকঝকে টেবিল। টেবিলের ও-পাশে আরো দুখানা চেয়ার। মাথার ওপরে চক্‌চকে সাদা ফ্যানটা ঘুরছে আস্তে আস্তে। টেবিলের ওপর নানান ধরনের অসংখ্য বই ছড়ানো। একটা মস্ত কাঁচের আলমারির অর্ধেকটা চোখে পড়ে। উজ্জ্বল কাঁচের পাল্লার মধ্যে দিয়ে বইগুলোর কিছু কিছু দেখা যায়। সুন্দর কালো চামড়ায় বাঁধানো বইগুলো। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক ভালো ভালো কবিতার বই আছে

ভাবলো। দেয়ালে টাঙানো একখানা সুন্দর ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো বাতাসে নড়ছে। এ-ছাড়া ঘরখানা ছবির মতো আঁকা আঁকা মনে হয়।

চুপচাপ। কোনো শব্দ নেই। বাবা শুধু মাঝে মাঝে একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে আর একআধবার গলাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে। ঘরের লম্বা পর্দাটা একটু কেঁপে উঠলো। পরে সেটা একপাশে সরে গেলো আস্তে আস্তে। ঘরে ঢুকলো বিশ্ববন্ধু আর প্রায় তারই বয়সী একটি মেয়ে। সুন্দর মসৃণ চেহারা মেয়েটির। নিশ্চয় বিশ্ববন্ধুর ছোট বোন। এর আগে অনিন্দ্য তাকে আর কখনো দেখেনি। বিশ্ববন্ধুকে দেখে মনে হলো তার আরো বেশি মোটা হয়েছে। দুজনেরই হাতে চক্চকে মলাটের বই। বাবার সামনের দুখানা চেয়ারে তারা বসলো, বইগুলোকে টেবিলেব ওপর ছড়িয়ে দিলো। বিশ্ববন্ধু হাত বাড়িয়ে বাবার হাতে কি একখানা বই তুলে দিলো। বাবা হাতে নিলো বইখানা। তারপর আস্তে পাতা ওল্টাতে লাগলো। একটা জায়গায় এসে থামলো। সেই জায়গায় হাত চেপে রেখে ফের একবার গলা সাফ করে নিলো। পড়াতে আরম্ভ করলো এবারে বিশ্ববন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে। তার ছোট বোন মাথা নিচু করে ছিলো টেবিলের ওপর। অনিন্দ্যর মনে হলো বাবা কবিতা পড়াচ্ছে নিশ্চয়। কবিতাটা তার খুব জানা-জানা। মাঝে মাঝে কিছু কিছু লাইনও তার কানে স্পষ্ট ভেসে এলো। তার একবার মনে হলো বাবা কবিতা পড়তেই জানে না। শুধু শুধু বেসুরে চেঁচাচ্ছে। এর চেয়ে মাথা নিচু করে ঘাড়গুঁজে অঙ্ক কষালেই যেন বাবাকে ভালো দেখায়। বাবার গলার স্বরটাও কেমন-কেমন যেন। এরকম গলায় কবিতা পড়লে মোটে ভালো

লাগে না তার। সে তো কবিতা আবৃত্তি করেছে কতোবার কতো জায়গায় কতো লোকের সামনে কতো আলোর মাঝখানে। হাততালির চোটে কান ফেটে যাবার জোগাড়। একেক সময় নিজের গলা নিজের কানেই পৌঁছোয়নি। বেশ মনে পড়ে তার সেবার পাড়ায় কি একটা উৎসবে সে কেঁদে ফেলেছিলো আবৃত্তি করতে করতে। টুকরো টুকরো এখনো সে মনে করতে পারে—

—বিরাট বাংলা দেশের কতো না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে

বাংলা দেশ, কতো বড় বাংলা দেশ! তাদের বাড়ির মাথার ওপরে তো কলকাতার আকাশ। আর কিসের মথায় বাংলাদেশের আকাশ। কলকাতার আকাশ কোনখানে গিয়ে বাংলাদেশের আকাশের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে! কোনোখানে হয়েছে নাকি?

কতো ছেলে! সত্যিই তো। কতো না ছেলেই বটে! সে, দিপু পানু আর আর কারা কারা সব যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ নিপু আর নিপুর মেজদাও তো বটে। অনিন্দ্যর নিজের কষ্টটা ভীষণ চেনা তার কাছে। তবু সে ভালো করে জানেই না কষ্টটা কিসের। আর সে ভাবে তাদের সবাইকার কষ্টটা কি এক? তার নিজের আর দিপু নিপু পানুর? আর নিপুর মেজদারও? তার জানতে ইচ্ছে করে কি কষ্ট নিপুর মেজদার? সেই রুক্ষ চুল, রোদ্দুরেপোড়া মুখ আর চশমার কাঁচের মধ্যে ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল দুটো চোখ স্পষ্ট হয়ে আসে তার সামনে। সত্যি কি ভালোই যে লেগেছিলো কবিতাটা তার। কবিতাটা মনে আছে। কবির নাম সে মনে করতে পারে

না। কবিতা পড়লে বাবাকে যে কি খারাপই দেখায় ফের ভাবলো।

এতোক্ষণ যেন তার হুঁস ছিলো না। তাকিয়ে ছিলো ঘরের দিকেই। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বিশ্ববন্ধুর মুখের ওপর। কি ভীষণ বোকা বোকা দেখাচ্ছিলো তাকে। তার মনে হলো কিচ্ছু বুঝতে পারছে না সে। একটি বর্ণও বিশ্ববন্ধুর কানে যাচ্ছে না। বাবা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বকে যাচ্ছে শুধু শুধু। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে বাবা। কেন এতো কথা বলে যাচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারে না সে। অথচ তার বেলায় বাবার কোনোদিনো এতোটুকু সময় হয় না। রাগে দুঃখে তার কান্না এসে যায়। তবু সে পণ করেছে বাবাকে আর একদিনো বলবে না পড়া দেখিয়ে দেবার জন্যে। এরকম করে বাবা যদি তাকে একটিদিনো পড়াতো তবে তার পড়ানোর এই দশা হতো নাকি। সে ভাবলো পড়াশুনো ছেড়ে দেবে একেবারে, আর কোনোদিন স্কুলমুখো হবে না। কাজ নেবে চায়ের দোকানে ঝুনকোদির দাদার মতো। ঢের ভালো হবে। তবু তো মাস ফুরিয়ে গেলে সাতটা টাকা দেবে হাতে। চা খেতে দেবে, চিনি মাখন দিয়ে পাঁউরুটি দেবে, মাঝে মাঝে ডিমও খেতে দেবে। তা-ছাড়া বন্ধু বান্ধবদের এদিক-ওদিক বিনিপয়সায় দুয়েক কাপ চাও খাওয়াতে পারবে। সে নিজে দেখেছে পান্নুর দাদা পান্নুকে চা খাইয়েছে রাজলক্ষ্মী কেবিনে।

রাজলক্ষ্মী কেবিনে পান্নুর দাদা আজ তিন বছর হলো কাজ করছে। বাবা তো ও-দোকানে বরাবর চা খাচ্ছে। প্রথম যেদিন পান্নুর দাদা বাবাকে চা দিতে আসে সে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে লজ্জায় এতোটুকু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মাথা নিচু করে। টেবিলের

ওপর নামিয়ে রাখতে পারেনি চায়ের কাপ। বাবা হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে কাপটা নিয়েছিলো। বাবা শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলো—হ্যাঁরে তুই এখানে? পড়াশুনো ছেড়ে দিলি—

পান্নুর দাদা একটিও কথা বলতে পারেনি। একইভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো। একটু নড়তে চড়তে পারেনি। বাবাও আর কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করেনি। সমস্ত কথা শুনেছিলো সে বাবা যখন বাড়ি ফিরে মার কাছে গল্প করেছিলো সব। বলতে বলতে বাবার গলা ধরে গিয়েছিলো, বাবা চশমার ঝাপসা কাঁচ পরিষ্কার করে নিয়েছিলো কাপড়ের খুঁটিতে, খুব ভালো মনে আছে তার।

তা হোক তবু ওরকম কাজ নেবে একটা। আর পড়াশুনো করতে হবে না তাকে তা-হলে। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। ওই হ্যারিকেনের টিম্‌টিমে আলোয় পুরোনো পুরোনো বইগুলোর ছেঁড়া ছেঁড়া পাতা ওল্টাতে তার ভালো লাগে না। চায়ের দোকানে কাজ নিলে আর তাকে বই নিয়ে বসতে হবে না একটি দিনো। মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে গেলে তবু সে কিছুক্ষণও জিরিয়ে নিতে পারবে খোলা পাখার নিচে বসে। যতক্ষণ দোকান খোলা থাকবে, দোকানে লোক থাকবে, মাথার ওপর পাখাও ঘুরবে।

বাড়িতে হাতপাখা ছাড়া উপায় নেই। পাখা চালাতে চালাতে হাত তার ধরে যায়। ছোড়দি ছাড়া অমন অবিশ্রাম পাখার বাতাস করতে আর কাউকে দেখেনি সে। চোখে ঘুম নেমে এলেও ছোড়দির হাত থেকে পাখা খসে পড়ে না। যখন শুধু ভীষণ ক্লান্তিতে চোখে আর তাকাতে পারে না তখন পাখাধরা হাতখানা তার কপালে এসে লাগবে আচমকা। চেঁচিয়ে ওঠে—

এই ছোড়দি কি করছিস ? লাগে না বুঝি ?

ছোড়দি তাড়াতাড়ি ঘুমের ঘোর কাটিয়ে ওঠে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কপালের একটা জায়গায় হাত রেখে খুব নরম গলায় জিজ্ঞাস করে, কোথায় লাগলো দেখি। সত্যি আমি দেখতে পাইনি রে।

সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে ওঠে, হ্যাঁ দেখতে পাইনি. সমানে ঠকঠক করে এসে লাগছে কপালটায়, দেখতে পাইনি— ছোড়দি তবু রাগ করে না। বলে, কই দেখি, সত্যি বিশ্বাস কর আমি কি ইচ্ছে করে করেছি।

তারপরে জোর করে কপালটার সবটুকু হাত বুলিয়ে দেবে! সে হাত দিয়ে বাধা দিতে যায়। ছোড়দিও ছাড়বে না। তার হাত সরিয়ে নিজের হাত রাখবে তার কপালে। তারপরে অনেকক্ষণ ঘুম হবে না। সে বলবে, ছোড়দি গল্প কর ঘুম আসছে না।

ছোড়দি বলবে, হ্যাঁ রাতদুপুরে তোমার সঙ্গে বকরবকর করি। ওদিকে বাবার ঘুম ভেঙে যাক আর কি।

সে জানে বাবা একবার চোখ বুজলে সহজে ঘুম ভাঙে না। কি অসহ্য গরম ঘরের মধ্যে। সত্যি সত্যিই ছোড়দির চোখের পাতা বুজে আসে। সে দুচারবার ডাকবে, এই ছোড়দি ঘুমুলি ? সত্যি সত্যি ঘুমুলি ?

দুয়েকবার উঁ আঁ অস্ফুট শব্দ আসবে ছোড়দির কাছ থেকে। তারপর একসময় চুপচাপ। সে বুঝতে পারে ছোড়দি ঘুমিয়েছে।

তার নিজের কেমন হাঁফ-হাঁফ ঠেকলো এতোক্ষণে। সত্যিই সে ঘেমে উঠেছে। কপালটায় হাত বুলোতেই কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম তরল হয়ে হাতে উঠে এলো। কতোক্ষণ এমন অন্যমনস্ক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো খেয়ালই ছিলো না তার। খেয়াল হলো যখন কাছাকাছি কোনো

একটা বাড়ির দেয়ালঘড়ির দশটা বাজার ঘণ্টা কানে এলো। প্রত্যেকটি ঘণ্টার আওয়াজ সে পরিষ্কার শুনতে পেলো। তার একবার মনে হলো যে-ঘরের ঘড়ি থেকে এ সময়-সঙ্কেত তার কানে এলো সে সেই ঘরের মধ্যেই রয়েছে। তা' হলে মানুষ মাঝে মাঝে এমন অন্যমনস্কও হয়ে পড়ে? সামান্য দেয়ালঘড়ির আওয়াজ না-হলে তার বুকের মধ্যে এমন করে ঢেঁকি পাড়বে কেন? সে তো প্রায় চমকেই উঠেছিলো। তার মনে হয় সে বুঝি ভীষণ কিছু একটা অন্যায় কাজ করছে, আর এমনি সময় হঠাৎ কেউ তাকে পিছন থেকে ধরে ফেলেছে।

আর একটুও দেরি না করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। কতো সময় যে তার লেগেছে গলিটা পার হয়ে আসতে ঠিক বুঝতে পারলো না। তবু তার মনে হলো অনেক সময় লেগে গেছে। এই এতটুকু একটা গলি পার হয়ে আসতে তার পুরো দশটি মিনিট লেগেছে। ঠিক মতো হাঁটলে এ গলি তো সে পাঁচ মিনিটে পার হতে পারে। কি এতো ভাবছিলো সে। আর সত্যিই সে মনে মনে অস্বীকার করতে পারলো না, সে ভাবছিলো অনেক কিছু। এতো বেশি ভাবনা একজোটে তার মাথায় এসেছে, সে ঠিক করতে পারে না কোনটা কার পর এসেছে। গলির বাইরে এসে বড় রাস্তাটা দেখে সে বুঝতে পারলো অনেক দেরি হয়ে গেলো বাড়ি ফিরতে আজ তার। ট্রামলাইনটার ওপারেই মস্ত পানের দোকানটা যেখানে মিষ্টি শরবৎ বিক্রী করে গরম পড়তে শুরু হলেই, সেটার দুটো আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এইবার একটু জোরে হাঁটতে শুরু করলো। একমাত্র স্কুলের দেরি হয়ে গেলে সে এমন জোরে পা-চালায়। তার একবার মনে হলো কিসের জন্যেই বা এতো ভয়। না-হয় দেরিই

হয়ে গেছে একদিন একটু বাড়ি ফিরতে। কি এমন অন্যায় হয়েছে তার। আর বাবা? বাবাতো সমস্ত কিছু লুকোয় মাব কাছে। মিথ্যে কথা বলে বাবা। সব মিথ্যে কথা। তার আবার চোখে জল এসে যায়। সে বাবাব কোনো কথা শুনবে না আর। শুধু ছোড়দিব জন্যেই যা তার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে। আর মাব জন্যেও একটু একটু। না হলে আর তার ভালোই লাগে না মোটে বাড়িতে থাকতে। সে চলে যাবে বাড়ি থেকে। সে চলে যাবে অনেকদূর। অনেক অনেক দূর। শুধু ছোড়দি জানতে পারবে তাব ঠিকানা। মাকেও জানাবে না। মা কাঁদবে? কাঁদুক —মা তো বাবার কথায় রাতদিনই কাঁদছে।

সবচেয়ে মজাব কথা সে যখন বাড়ি থেকে অনেকদূবে চলে গেছে ভাবছে, ঠিক সেই সময় সে বাড়িব খুব কাছে এসে পড়েছে। দরজায় পা দিতেই শুনতে পেলো মা ছোড়দিকে বলছে—যেমন বাপ তেমনি ছেলে। দুজনেব কেউ কি আমায় এতোটুকু শান্তি দেবে না? তুই পেটেব মেয়ে—

ছোড়দি আমতা আমতা করে বললো, এবকম সময় তো ও বড় একটা বাড়িব বাইরে থাকে না মা। বোধ হয় কোথাও আটকে পড়েছে।

গ্যাখ পারুল তুই পেটেব মেয়ে, তোর কাছে কি লুকোবো বল। তোর বাবাকে নিয়ে সারাটা জীবন ভাজা-ভাজা হয়ে গেছি। আর জ্বলতে পারি না ছেলেটাকে নিয়ে, অতবড় ছেলে হয়েও যদি বুদ্ধিশুদ্ধি না-হয়—কোথায় তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে সংসারের মুখ চেয়ে তা না—

ছোড়দি বললো, তুমি এবার হাসালে মা। ও যেন এক্ষুনি চাকরি করে কাল থেকে তোমায় খাওয়াবে।

বললেই তো তোদের মুখে ওই এককথা।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো কথাগুলো বলে। ছোড়দি বাধা দিয়ে বললো, একটা কথা শুনবে মা, আজ তুমি কিছু বলবে না বলো ওকে—

আদর দিয়ে আর কত বাঁদর করবি বল তো। এতো দেখে শুনেও কি তোদের লজ্জা হয় না একটুখানি। এর চেয়ে তোরা যদি আমার পেটে না আসতিস ছিলো ভালো।

মা এবার সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বোধ হয় রান্নাঘরের দিকেই গেলো। চট করে ফিরবে না মনে হলো।

সে এতোক্ষণে পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকলো। ছোড়দির মুখেব দিকে তাকিয়ে আজ একটু ভয় করলো তার। ছোড়দির মুখখানা ভীষণ ক্লান্ত কিন্তু ভয়ঙ্কর রকমের গম্ভীর। ছোড়দি ভীষণ দুঃখ পেলে এমন গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটাও কথা বলবে না। হ্যারিকেনের আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে নয়তো আঁচলটা মুখের ওপর চাপা দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকবে। আর এই সময়টাতে তার নিজেরও ভীষণ একটা কষ্ট হয়। তবু সে সাহস করে কথা বলতে পারে না ছোড়দির সঙ্গে। ঘরে ঢুকতে ছোডদি নিজেই জিজ্ঞাসা করলো প্রথমে, কোথায় ছিলে এতোক্ষণ?

সে আজ গোড়া থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো কারো কাছে হার মানবে না। তাই সে বললো, কি দরকার তোমার।

দরকার আমার নয়, দরকার মার।

কিচ্ছু দরকার নেই মার—একইভাবে উত্তর দিলো।

দরকার আছে কিনা দেখতেই পাবে।

ছোড়দিকে আরো বেশি গম্ভীর মনে হলো তার।

তোমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হবে কিনা—তাই।

ভারি তো স্কুল। বয়ে গেলো ছাড়িয়ে নিলে তো। কে যাচ্ছে স্কুলে।

কথাগুলো বলতে বলতে সে ঘামেভেজা জামাটা গা-থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দেয়ালের এককোণে। তারপরে খালি মেঝের ওপর শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে।

সে-রাত্রে সে কিছু খায়নি। মা ডাকাডাকি করেছিলো অনেক। ছোড়দিও অনেক সাধাসাধি করেছিলো। কিন্তু সে সেই যে শক্ত হয়ে মেঝেতে পড়ে রইলো তাকে আর কেউ তুলতে পারলো না। কেন তাকে সবাই মিলে এমন শাসন করে সে বুঝতে পারে না। তার সামনে তার আড়ালে সবাই তাকে দিনরাত দূরছাই করবে। অথচ কিসের অন্যায় তার সে বোঝে না। আর বাবা যে এতো অন্যায় করছে, তার বেলা? তা কারো চোখে পড়ে না। ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল এসে যায়।

বাবা তো তার চেয়ে অনেক বেশি মিথ্যে কথা বলে। তার কেন এতো দুঃখ, কেন তার এতো বেশি কষ্ট, সে তা কিছুতেই বুঝতে পারে না। আর কেন পারে না তাও সে জানে না। আজো তার ভীষণ দুঃখ। অনেকদিন তার এতো বেশি কষ্ট হয়নি। মনে অনেক জোর করলো সে কিছুতেই কাঁদবে না আজ। তবু সে কান্না চাপতে পারলো না। এতো বেশি কান্নাও পায়নি অনেকদিন। সে কেঁদে ফেললো। উপুড় হয়ে শুয়ে মুখটা একহাতে চেপে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। যতো বেশি কান্না তার এলো ততো বেশি তার মনে হলো কেউ তাকে একবারো বলবে না কেন কাঁদছে সে। আর এ-কারণেই তার কান্না আরো বেশি বেড়ে গেলো।

সমস্ত শরীরটা তার মনে হলো ঘামের সঙ্গে মাটিতে এঁটে গেছে। সে একটা প্রাচীরপত্রে একটি ছেলের ছবি দেখেছিলো।

ছেলেটার মাথাটা মাটির দিকে নিচু-করা। পিঠটা বেঁকে গেছে, আর বুকের হাড়পাঁজরা ঠেলে উঠেছে। তার নিজেকে অনেকটা সেই প্রাচীরপত্রের গায়ে আঁকা ছবিটার মতো মনে হলো। কেমন যেন ঘামা-ঘামা ক্লান্ত আর ভীষণ দুর্বল রুগ্ন। সে যেন ভালো করে পাশ ফিরতে পারছে না, গলা ছেড়ে কথাও বলতে পারছে না। কেমন একটা দমবন্ধকরা কষ্ট! অসহ্য যন্ত্রণা। তেষ্টায় তার গলা ফেটে যাচ্ছে তবু একগ্লাস জল চাইতে পারছে না। কিছুক্ষণ এমন কাটলে সে বুঝতে পারলো ছোড়দি মাথার কাছে এসে বসেছে। ঘরটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার-অন্ধকার। তবু ছোড়দির মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে ছোড়দিব চোখদুটো ফুলে গেছে। ঘামে কান্নায় মুখখানা খুব কালো দেখাচ্ছে। তবু ছোড়দিকে দেখতে ভালো লাগছে তার। যখন খুব সেজেগুজে সুন্দর হয়ে ওঠে তখন যেমন লাগে এখন যেন তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। সে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছোড়দির দিকে। তারপর প্রায় অবাক হয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ছোড়দি তুই এখনো ঘুমুসনি!

চুপ! বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। ছোড়দি ঠোঁটে আঙুল চেপে বললো।

সে একবাব ঘরের চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে নিলো। দেখলো বাবার ঘুম ভাঙার কোন আশঙ্কা নেই। বাবা ওপাশ ফিরে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। এবার খুব আস্তে আস্তে বললো, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে ছোড়দি। আমার ভাতটা দিবি?

ওঠ—

সে ছোড়দির পিছন-পিছন রান্নাঘরের দিকে চললো। ছোড়দি জল দিলো, খুব যত্ন করে ভাত বেড়ে দিলো থালায়। যতক্ষণ

না তার খাওয়া শেষ হলো ছোড়দি সমানে বসে রইলো। সে বেশ পেট ভরে খেয়েছে। ছোড়দির মুখের দিকে চেয়ে সে খুশির হাসি হাসলো।

আবার এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লো। পেট তার বেশ ভরে গেছে। এবার ঘুম পাচ্ছে আস্তে আস্তে। মনে হলো এক্ষুনি সে ঘুমিয়ে পড়বে। ছোড়দির গলা কানে এলো এসময়ে।

আচ্ছা এবার বলতো, আজ এতো রাত্তির করে বাড়ি ফিরলি কেন? সত্যিকথা বলবি আমাকে।

সত্যি বলবো। আগে বল কাউকে বলবি না।

সত্যি বলছি।

না গা-ছুঁয়ে বল আগে।

এই গা-ছুঁয়ে দিব্যিকরে বলছি, বল এবার।

বাবা কোথায় যায় দেখতে গিয়েছিলুম।

কোথায় যাবে আবার। বাবাতো দাবা খেলতে যায় হরি-কাকাদের ওখানে।

মিথ্যে কথা। বাবাতো বিশ্ববন্ধুকে পড়াতে যায়।

সে ছোড়দির মুখের দিকে তাকালো একবার। ভেবেছিলো সে ছোড়দিকে ভীষণ অবাক করে দেবে কথাটা বলে। কিন্তু ছোড়দি একটুও অবাক হলো না দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলো।

ছোড়দি উল্টে বললো, আমি জানি।

জানিস? কি করে জানলি?

তুই যা অনেক পরে জানতে পারিস, আমি তা অনেক আগে জেনে ফেলি। কথাগুলো বলে ছোড়দি একটু হাসলো।

কি করে জানলি সত্যি করে বল। বলতেই হবে—সে ছোড়দির হাত চেপে ধরলো।

বলবো। কিন্তু তার আগে বল মাকে একটি কথাও তুই বলবি না।

না সত্যি বলছি বলবো না—না না না—অনিন্দ্য ছোড়দির গা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলো।

বাবা বলেছে। ছোড়দি আস্তে আস্তে বললো।

অনিন্দ্য এবার নিজেই অবাক হয়ে গেলো। বাবা তবে ছোড়দিকে সব কথা বলে। বাবা ছোড়দিকে এতো ভালবাসে। যে-কথা বাবা মাকে বলে না ছোড়দিকে সে-কথাও বলে। তবে কেন বাবা ছোড়দিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলো। কি রকম কান্নাটা কেঁদেছিলো ছোড়দি ভাবলে তার নিজেরই কান্না এসে যায়। নিপুর মেজদা কতো করে বুঝিয়েছিলো বাবাকে। কিন্তু বাবা কারো কথা শোনেনি। নিপুর মেজদাও সেই থেকে তাদের বাড়িতে আসা কমিয়ে দিলো। নিপুর মেজদা এলেই ছোড়দি কেমন যেন লজ্জায় এতোটুকু হয়ে যাবে, তারপরে দুহাতে মুখ ঢেকে কেবল কাঁদবে আর কাঁদবে। সে আজো বুঝতে পারে না, কিছুতেই বুঝতে পারে না, কেন বাবা ছোড়দিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলো।

একটি কথাও কিন্তু মাকে বলবে না, ছোড়দি আবার বললো।

অনিন্দ্য কথা কইলো না। শুধু মাথা নেড়ে জানালো সে মাকে বলবে না একটি কথাও। ছোড়দি উঠে নিজের জায়গায় চলে যাচ্ছিলো, সে কি-একটা ভেবে আবার তাকে ডাকতে যাবে এমনি সময় একরাশ আলো এসে তার চোখে প্রায় ধাঁধা লাগিয়ে-দিলো। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। ভালো করে চোখ রগড়ে

দেখলো বাবার মাথার সামনে জানালাটা দিয়ে অল্প-অল্প আলো ঘরে আসছে। মাথার কাছে হ্যারিকেনটা জ্বলছে। ছোড়দি নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। সে এবার সত্যি সত্যি অবাক হলো। সে কি তবে এতক্ষণ সবটাই স্বপ্ন দেখছিলো। ছোড়দি সত্যিই তার সঙ্গে কথা কয়নি। ওইতো ছোড়দি ঘুমুচ্ছে, কী ভীষণ ঘুমুচ্ছে। মিছিমিছি তেল পুড়ছে ভেবে সে হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দেবার জন্যে বাবার মাথার কাছে উঠে এলো। বাবার মাথার কাছে একখানা বই পড়ে রয়েছে ভাঁজ-করা। এখনো সবটা পড়া হয়নি। আশি আর একাশি পাতার মাঝখানটাতে চশমাটা রয়েছে। অনেক রাত্তির পর্যন্ত পড়েছে বুঝতে পারলো সে। তারপরে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আলোটা নিভিয়ে দিতেও ভুলে গেছে।

বাবার মুখখানা ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একগাল দাড়ি। মনে হচ্ছে অসুখ করেছে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার দুঃখ পেলো সে। তাড়াতাড়ি বইখানা তুলে নিলো হাতে করে। ফের অবাক হলো। এই বইখানাইতো বাবা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলো সেদিন। কিছুতেই তাকে পড়তে দেয়নি। বইখানা নিপুর মেজদা ছোড়দিকে দিয়েছিলো, ছোড়দির জন্মদিনে। প্রথম পাতায় এখনো নিপুর মেজদার হাতের লেখা জ্বলজ্বল করছে—"পারুল-কে তার জন্মদিনে।" বাবা খুব মন দিয়ে পড়েছে বইখানা। অনেকগুলো পাতার লাইনে লাইনে দাগ দিয়ে রেখেছে। বইতে দাগ দিয়ে পড়া বাবার ভীষণ অভ্যাস। এই বইটাতেই তো সে পড়েছিলো সেই কবিতাটা। খুব সম্ভব চব্বিশ কি পঁচিশ পাতায় আছে সেটা। সে পাতা উল্টিয়ে দেখলো তার ঠিকই মনে আছে। পঁচিশ পাতার ঠিক মাঝখানেই রয়েছে কবিতাটা। তার চোখ পড়লো।

সে ভালো করে রগড়ালো চোখ দুটোকে। এবার মনে হলো চোখে আর একটুও ঘুম লেগে নেই। সে পরিষ্কার চোখে পড়লো— এই তো সেই—

কতোবার এলো কতো না দস্যু! কতোনা বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কতো গ্রাম উজাড়

সে মনে মনে বেশ খুশি হলো। এখনো মনে আছে তবে তার লেখাটা। বাবা যদি তাকে একটু ভালো করে দেখে সে তো অনায়াসে ভালো করতে পারে পড়াশুনোয়। না, বাবার ওপর সে কিছুতেই কেন যেন খুশি হতে পারে না। কোনোদিনো না।

আবার বাবার মুখের ওপর তার চোখ পড়লো। কী ভীষণ রোগা যে হয়ে গেছে বাবা। সত্যি বলবার নয়। আচ্ছা, যে-বাবা তাকে একটুও ভালোবাসে না আর, সেই বাবাই যখন খুব রোগা হয়ে যায় তখন সে এতো দুঃখ পায় কেন? বাবা দাড়ি না কামালে সে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। বাবা ময়লা কাপড়জামা পড়ে থাকলে তার নিজেরই কেমন লজ্জা-লজ্জা করবে। বাবাব মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে অনেকখানি ভেবে ফেলে। ভাবতে ভাবতে কি একটা ভেবে সে হঠাৎ যখন চমকে ওঠে আশঙ্কায় তখন আবাব ফিরে আসে নিজের মধ্যে। না এতো বেশি ভাববে না সে আর কখনো। সে হ্যারিকেনের আলোটার দিকে চেয়ে দেখে চিমনির মধ্যে আলোব শিখাটা কাঁপছে অল্প অল্প। বুঝতে পারলো ঘরে সকালের বাতাস আসতে আরম্ভ করেছে একটু একটু। এরপর সত্যি সত্যিই বেশ খানিকটা বাতাস এলো ঘরের মধ্যে। হ্যারিকেনের আলোটা বেশ জোরে কেঁপে উঠলো একবার। সে চিমনিটা তুলে ফুঁ-দিয়ে নিভিয়ে দিলো আলোটা। খুটখাট আওয়াজো হলো একটা। বাবা

এবার পাশ ফিরলো আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে। জড়ানো জড়ানো গলায় কি বললো অস্পষ্ট বোঝা গেলো না। সে বুঝলো বাবার ঘুম ভাঙতে এখনো দেরি আছে। আরো অনেকবার এরকম করবে, তারপর অনেক বেলায় ধড়মড় করে উঠে বসে, একেবারে সোজা চা চাইবে ছোড়দির কাছে, কই পারুল চা নিয়ে আয় চট করে।

আর ছোড়দিও হাতের সব কাজ ফেলে ছুটবে বাবার চায়ের জোগাড় করতে।

॥ ৪ ॥

স্কুল বন্ধ থাকলে অনিন্দ্যর কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, সময় কাটতেই চায় না। আবার স্কুল খোলা থাকলেও কেমন একটা একঘেয়েমি ভাব। নিয়ম করে পড়া মুখস্ত করো, বই কাঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে স্কুলে যাও, তারপর সেই দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত বন্দী থাকো। রোজ স্কুলে যেতে তার সত্যি কথা বলতে ভালো লাগে না মোটে। আবার বাড়ি থাকলেও সমস্ত দুপুরটা কি করে কাটাবে ভেবে পায় না। তবু স্কুলে গেলে অনেক ছেলের সঙ্গে দেখা হবে। অনেক সময় টিফিনটাও তার ভালো কাটবে না। মাঝে মাঝে সে-সময়টাও বসে বসে পড়া তৈরি করতে হয়। টিফিনের পরেই চন্দ্রনাথবাবুর ভূগোলের ক্লাস। চন্দ্রনাথবাবুকে দেখলেই তার ভূগোলের সমস্ত পড়া কেমন গুলিয়ে যায়। আর চন্দ্রনাথবাবু ক্লাসে ঢুকলেই তার মনে হবে তাঁর চোখ প্রথম পড়বে তার দিকে। সে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকাব চেষ্টা করে। অন্য কোনো ছেলের দিকে বা জানালার বাইরে। যেন সে ক্লাসেই বসে নেই এমনি ভাবখানা। মাঝে মাঝে বই বা খাতার পাতা ওল্টাবে, খুব অন্যমনস্ক থাকবার চেষ্টা করবে। তবু কি রেহাই পাবার জো আছে। চন্দ্রনাথ-বাবু ঠিক রোল নাম্বার ধরে ডাকবেন প্রথমে, তারপর আরও সজাগ করে দেবার জন্যে ডাকবেন নাম ধরে। তাকে এবার তাকাতেই হবে। ভাবলেও তার গায়ে কাঁটা দেয়। পরপর প্রশ্ন করে যাবেন চন্দ্রনাথবাবু, আর না পারলেই কি দুঃসহ অপমান! এসব ভেবে তার অনেক অনেক দিন স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না একদম।

আবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন অনেক দিন স্কুল বন্ধ থাকে সে হাঁপিয়ে ওঠে। খালি মনে হবে কবে খুলবে কবে খুলবে। স্কুল খুললে বাঁচি। গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুললে প্রথমটা বেশ ভয়-ভয় করে, কতোদিনকার জমানো পড়া এবার জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করবেন মাষ্টারমশায়রা। তার এক সময় মনে হবে সে যেন প্রথম স্কুলের দরজার মধ্যে পা দিচ্ছে। কিচ্ছু তার জানা নেই। সব কিছু তার কাছে নতুন। গ্রীষ্মের ছুটি হতে এখনো বহু দেরি। এর মধ্যে আবার স্কুল বন্ধ হয়ে গেলো। কবে খুলবে কে জানে। গরমের ছুটির আগে স্কুল এমন বন্ধ থাকতে কোনোবারই দেখেনি সে।

সামনের দরজায় মস্ত বড় তালা ঝুলছে। রাস্তা থেকে ওপর আর তলার যে-ঘরগুলো দেখা যায় সেগুলোর সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ রয়েছে। স্কুলের সামনের রাস্তাটা দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে যায় সে দুপুরবেলা। বাড়িতে তখন বাবা থাকে না। স্কুল বন্ধ থাকলেও বাবা বড় একটা বাড়ি থাকে না, মা পড়ে পড়ে ঘুমুবে বিকেল পর্যন্ত। ছোড়দি কিছু একটা সেলাই করবে, নয়তো একখানা বই খুলে রাখবে চোখের সামনে, পড়বে কিনা ঠিক বুঝতে পারা যাবে না, হয়তো ভাববে অনেক কিছু আকাশপাতাল আর নয়তো বা চলে যাবে কাছাকাছি কোনো বাড়িতে গল্প করতে। সেও সুযোগ বুঝে ক্যারম খেলতে বেরিয়ে যাবে পান্নুদের ওখানে।

মাঝে মাঝে সে ইচ্ছে করে হেঁটে যাবে স্কুলের সামনের রাস্তাটা দিয়ে। খুব চওড়া না হলেও বেশ মস্ত লম্বা রাস্তাটা। স্কুলের ওদিকের ফুটপাতে রোদ পড়ে না কোনোদিন। লাহাদের মস্ত বাড়িবাগান। এ-মোড় থেকে ও-মোড়। লোহার রেলিঙে ঘেরা বাগান। কতো ফুলের গাছ যে আছে গুণে শেষ করা যায় না। ওদিককার

ফুটপাত ধরে হাঁটলে তার একেকসময় তাই মনে হয়, সে কলকাতায় নেই। কলকাতার বাইরে অন্য কোনো জায়গায় হাঁটছে। সেখানে ট্রাম-বাস-মোটরের আর মানুষের ঠেলাঠেলিতে পথ চলতে কষ্ট হয় না। কেবল অজস্র ফুল আর লতাপাতার বন দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে, তার মনে হবে। কতো রকমের পাখীই যে আসে লাহাদের ওই বাগানের ফুলগাছগুলোব মাথায় তার ঠিক নেই। টিফিনের সময় অনেকদিন সে দরোয়ানের হাতে পায়ে ধরে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে লাহাদের বাগানের এই বেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকবে। খুব জোরে টেনে টেনে নিশ্বাস নেবে। তার মনে হবে এতোক্ষণে সে সত্যিকার নিশ্বাস নিচ্ছে। স্কুলটাকে এ-সময়ে জেলখানা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সে ভাবে একেকবার—কলকাতায় এতো ভালো ভালো বাড়ি থাকতে তাদের বাড়িটা অমন বিচ্ছিরি হলো কেন। তার খুব ভালো লাগে এ-জায়গাটা, খুব ভালো লাগে। জোরে বাতাস দিলে বাগানের অনেক ফুল পাতা উড়ে উড়ে এসে পড়বে ফুটপাতের ওপব। চমৎকার লাগে দেখতে। মাঝে মাঝে সে দেখে কুচি কুচি বকুল ফুল প্রায় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে ফুটপাতের এক পাশটায়।

তাদের স্কুলে যে-লোকটা খাতা পেন্সিল রুলটানার স্কেল বিক্রী করতে আসে সে-লোকটাও এসে বসবে এই ফুটপাতে লাহাদের রেলিং-এর গা-ঘেঁষে। এ-জায়গা ছাড়া সে আর অন্যকোনো জায়গায় বসবে না। টিফিনের ছুটি হলে স্কুলের বাইরে বেরুলেই দেখতে পাবে ও-ফুটে যদি একটি লোকও না হাঁটে, তবু ও ঠিকই বসে আছে। গায়ের জামাটা গা থেকে খুলে পাশে রেখে দেবে। মাঝে মাঝে সেইটাকেই গায়ের চারপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাবে। বড় টিনের সুটকেসটা

সামনে খোলা থাকে। তার মধ্যে আছে প্রথম ভাগ, ধারাপাত, খাতাপেন্সিল রুলটানার স্কেল। আর এরই সঙ্গে আছে চকোলেট বিস্কুট, লজেন্স আর ছোটো একটা কাঁচের বোতলে চানাচুর। টিফিন হলেই তার চারপাশ ঘিরে বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে যাবে ছেলেদের। বিশেষ করে নিচু ক্লাসের ছেলেদের। সবাই যে রোজ খাতা পেন্সিল কেনে তা নয়। চানাচুর আর চকোলেটের লোভেও আসে অনেকে। একখানা খাতা বা একটা পেন্সিল কিনলেই দুটি চানাচুর বা একটা লজেন্স ফাউ দিতেই হবে তাকে। তাছাড়া মজা করে ভিড় জমাবার জন্যেও আসবে সবাই। বয়সে লোকটা তার বাবার চেয়েও অনেক বড়ো। মাথার অনেক চুল পেকে গেছে, দাড়িও কাঁচাপাকা। তার সবচেয়ে কষ্ট হয় যখন ভিড়ের মধ্যে কেউ পয়সা ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। লোকটা খেয়ালই রাখতে পারে না কে পয়সা না-দিয়ে চলে গেলো। আবার যখন সে অন্যমনস্ক হয়ে কাউকে কিছু বিক্রী করতে থাকে, তখন কেউ হয়তো দেখতে না-দেখতে চক্ষের নিমেষে একটা বড় লালনীল পেন্সিল তুলে নিয়েছে স্যুটকেসটা থেকে। সে একেকসময় ভেবেছে বলে দি, কিন্তু ভয় পেয়েছে। যদি ছুটির পর সবাই দল বেঁধে তাকে মারে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুললে তাকে আবার ঠিক এক জায়গায় দেখতে পাবে সে। স্কুল বন্ধ থাকলে তার কি করে বিক্রী হয় জানতে ইচ্ছে করে। অনেকদিন তো স্কুল বন্ধ থাকে, তবে? কোথায় ও বিক্রী করতে যায় ওর জিনিসপত্তর? শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। কেমন লজ্জা করেছিলো তার। যদি বলে—না বিক্রী হয় না এসময়টা একেবারে। ভাবলেও কষ্ট হয় তার। সে শেষকালে ভাবে ও নিশ্চয় দেশে চলে যায়

এ-সময়টায়। দেশে বোধহয় ওর বাড়িঘরদোর আছে। স্কুল বন্ধ হওয়াতে তারও আসা হঠাৎ বন্ধ হয়েছে।

তালাদেয়া বন্ধ দরজাটা দুহাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে ফাঁক করলেই স্কুলের সামনের উঠোনটা দেখতে পাওয়া যাবে। সে শুধু দেখতে পায় দরোয়ান গিরিগোবর্ধন ঘুমুচ্ছে আমলকি গাছটার নিচে খাটিয়া পেতে। মস্ত ভুঁড়িটা উঁচু হয়ে থাকে। আর আমলকি ডালটা থেকে পাতা ঝরেঝরে কখনোসখনো এসে পড়বে তার ভুঁড়িটার ওপর। ঝিরঝিরে হাওয়া দেবে, পাতা ঝরে ঝরে পড়বে আর নাক ডাকিয়ে ঘুমুবে দরোয়ানজী। এই আমলকি গাছটা যে ওই জায়গায় কতোদিন দাঁড়িয়ে আছে তা একমাত্র বাংলার মাষ্টারমশায় কুমুদবাবুই বলতে পারতেন।

আমলকি গাছটার দিকে তাকালেই তার মনে পড়ে কুমুদবাবুর কথা। দীর্ঘ কালো চেহারা ছিলো কুমুদবাবুর। কুমুদবাবু যখন বাংলা পড়াতেন তখন মনে হতো সমস্ত ক্লাস ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন চুপচাপ থাকতো ক্লাস যে কেউ যদি একটু গল্প করার চেষ্টা করতো সে সবাইকার চোখে পড়ে যেতো। তিনি একটিও কথা বলতেন না। শুধু একটানা পড়িয়ে যেতেন। সমস্ত ছেলেরা একজোটে কুমুদবাবুর হয়ে তাকে শাসন করতো চোখ পাকিয়ে।

সবচেয়ে ভালো লাগতো তার শীতকালের দুপুরগুলো। কুমুদবাবু পুবদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমলকি গাছটার দিকে তাকিয়ে একটার পর একটা ছড়া কেটে যেতেন বা মাঝে মাঝে কবিতা বলতেন। তাঁর চারপাশে ছেলেরা এসে আস্তে আস্তে ঘিরে দাঁড়াতো। কেউ হয়তো বললো: মাষ্টারমশায় ছড়া বলুন—

তিনি গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চশমার কাঁচটা

মুছে নিতে নিতে বললেন—রেলগাড়ির ছড়া শুনবি ? শোন—এই বলে একজনের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তুই বল :

কখন ছাড়বে কতোদূর যাবে গাড়ি ?
কলকাতা থেকে কোন দেশে দেবে পাড়ি ?

তারপর আরেকজনের দিকে ফিরে বললেন, তুই এবার বল :

তুমিই বলোনা কোনখানে তুমি যাবে ?

এরপর নিজেই হাত নেড়ে বলে চললেন—

এই ধরো ভায়া লাহোরে কি পাঞ্জাবে।
এই না বললে যাবে তুমি পশ্চিমে ?
যাবার কথাতো জাপানে, না ভাই চীনে

নিচু ক্লাসের ছেলেরা খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে। এমনি করতে করতে টিফিনের ঘণ্টা বেজে যায়।

একদিন শীতকালের কথা মনে আছে। অঘ্রাণ কি মাঘ মাস। পুবদিকের বারান্দায় রোদ্দুরে গা-দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কুমুদবাবু। সে কুমুদবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমলকি গাছটাকে চিনতেই পারা যাচ্ছিল না। প্রায় নেড়া হয়ে গেছে। ভীষণ শুক্‌নো আর রোগা দেখাচ্ছিলো গাছটাকে। কুমুদবাবু কখন আলতো হাত রেখেছেন তার কাঁধে সে বুঝতেই পারেনি। কুমুদবাবু নিচু হয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন : গাছটা কি রকম বুড়ো হয়ে গেছে দেখেছিস। শীতে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে, তবু গায়ে একটা জামা নেই।

সে দেখলো বাতাসে গাছটা সত্যি ভীষণ দুলছে। হেসে ফেললো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

আবার বললেন তিনি, আর ওই গাছটার তলায় ভালো করে চেয়ে ছাখ—কে বসে আছে বল দিকি রোদ্দুরে ?

সে ভালো করে তাকিয়ে দেখে গাছটার নিচে মোটা একখানা কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে আছে শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাসের কাজ হেডমাষ্টারমশায়ের দরজার সামনে একটা টুলে বসে থাকা। দরজার সামনে পর্দা টাঙানো। আর সেই ঝোলানো পর্দার বাইরে বসে থাকবে শ্রীনিবাস। সে অবাক হয়ে বলে উঠলো, ওতো শ্রীনিবাস স্যার।

হ্যাঁ তাইতো বলছি, কুমুদবাবু বললেন, অতো মোটা কম্বল চাপিয়ে রোদ্দুরে পিঠ দিয়েও কাঁপছে। একটা ছড়া মনে আসছে শুনবি?

তার মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি বুঝলেন এতোটুকু অনিচ্ছা নেই। শোন, বলে, বলতে লাগলেন—

বহুদিন আগে জ্বর হয়েছিলো গায়ে দিয়েছিলো কম্বল
তারপর তাকে গা-থেকে খোলেনি শ্রীনিবাস
খুললেই নাকি শরীরে সে পায় কম বল
এই বলে ফের মুড়ি দিয়ে গায়ে দিলো
যদি আসে জ্বর। এটা অঘ্রাণ মাস।

তিনি এমনভাবে বলবেন যে বলবার ঢঙেই হেসে ফেলে সে।

আর এই কুমুদবাবু যেদিন মারা গেলেন সেদিনের কথাটা মনে পড়লে তার কেমন দুচোখ জলে ভরে আসে। সমস্ত দিনের মধ্যে কেবল তো দুপুরবেলায় কুমুদবাবুর সঙ্গে তার দেখা হতো, তবু কুমুদবাবুকেই কতো বেশি আপনার মনে হতো।

শীতকালের দুপুর। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সেদিনো যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটেছে এমনি সময়ে হেডমাষ্টারমশায় ঘরে ঢুকে সংবাদ দিলেন, কুমুদবাবু মারা গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেলো। কেমন বিষণ্ণ আর অসহায় মনে হয়েছিলো নিজেকে তার। পরীক্ষা না-হয় বন্ধ হলো হোক, কিন্তু —কিন্তু কুমুদবাবু আর বাংলা পড়াবেন না, কোনদিনো না। আর শীতকালের দুপুরবেলায় পুবদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রবিঠাকুরের কবিতা বলবেন না। কোথা থেকে কি যেন একটা হয়ে গেলো। কুমুদবাবুর অসুখের খবরটাও ভালো করে শোনেনি সে। তারপর আর ভালো করে পরীক্ষাই দিতে পারেনি সেবার। কোথা থেকে যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো।

এইরকম যতোরাজ্যের কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তাটা ফুরিয়ে আসবে। এক সময়ে এসে পৌঁছে যাবে পান্নুদের বাড়ির দোর গোড়ায়। বস্তির ঘরও সময় সময় এর চেয়ে ভালো মনে হয়েছে অনিন্দ্যর। রাস্তার ধারে জানালা তো নয় একটা ছোটো ঘুলঘুলি। তার মধ্যে দিয়ে ভেতর দিকে চাইলো সে। দেখতে পায় না প্রথমটা কিছুই, শুধু মনে হবে খানিকটা অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই জায়গাটায়, বাইরের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে থাকে তখন। তারপর অনেকক্ষণ ভালো করে চোখ মেলে রাখবে। দেখতে পাবে ছেঁড়া মাদুরটা মেঝেতে ছড়ানো। আর তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে পান্নু। ঝুমকোদি একপাশে বসে সেলায়ের কল চালাচ্ছে। ওই অন্ধকারে যে কি করে চোখে দেখে ঝুমকোদি সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। সে ছোট্ট একটা ঢিল বা কাগজের গোলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারবে পান্নুর গায়ে। পান্নু সজাগ হয়ে উঠবে, পরে অভ্যাসমতো তাকাবে জানালাটার দিকে। তাকালেই দেখতে পাবে তার মুখ।

তারপর ব্যশ। আস্তে আস্তে ছেঁড়া হাফসার্টটা কোনোরকমে গায়ে গলিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। এমন কায়দায়

দরজা খুলবে কারো সাধ্যি নেই একটু শব্দ পায়। তারপর একবার বাড়ির বাইরে পা ফেলতে পারলে আর কে, দেখে। দুজনে প্রথমটা ভেবে পায়না কি করে। পান্নুর মুখটা একটু ভারি ভারি। সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলো ও কিছু একটা জিজ্ঞাসা করবে ভাবছে। পান্নু ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলো : কবে নাগাদ ইস্কুল খুলবে বলতো।

সে একটু অবাকই হলো। বললো, তোর আবার স্কুলের ওপর কবে থেকে এতো টান হলো রে। স্কুল খুললেই তো স্কুল পালাবি।

পান্নু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। সত্যিই তার তাই হবার কথা। তবু সে আবার আমতা আমতা করে বললো—না, মানে ইস্কুল খুললেই তো আবার মাইনের তাড়া দেবে। তোর আর কি, আমার তিনমাসের মাইনে পড়ে আছে জানিস।

তারও মাইনে বাকি আছে একমাসের। ওর বাবা স্কুলে চাকরি করেন তাই হেডমাষ্টারমশায় ওকে খুব বেশি কিছু বলেন না। পান্নুর সত্যিই মুস্কিল। বেচারা বিনামাইনেয় পড়বার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত হাফ-ফ্রি ছাড়া আর কিছু হয়নি। পান্নুর জন্যে সে বাবার কাছে অনেক করে বলেছিলো। বাবাও প্রায় হেডমাষ্টার-মশায়ের হাতেপায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলো, কিন্তু পান্নুকে একেবারে ফ্রি করে দিতে পারেনি বাবা। হেডমাষ্টারমশায় ভীষণ গম্ভীর মুখ আর ততোধিক গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিলেন, এ কি দানছত্র মশাই। রোজ দুটো চারটে করে ফ্রি আর হাফ-ফ্রি করি, আর শেষকালে স্কুল—এর চেয়ে স্কুল তুলে দিলেই হয়। আর তা-ছাড়া আমি নিজে আর এ-সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে থাকছি না মশাই, সোজাসুজি সেক্রেটারিকে গিয়ে ধরুন। যা ভালো বোঝেন তিনিই করবেন।

বাবা এর ওপর আর কি বলবে। তবে শেষপর্যন্ত হাফ-ফ্রি হয়েছিলো পান্নুর, আর তো বাবারই জন্যে। পান্নু প্রথম প্রথম পড়াশুনো ভালই করছিলো, কিন্তু পান্নুর দাদা স্কুল ছেড়ে চায়ের দোকানে কাজ নিতেই পান্নুর মাথা কেমন যেন বিগড়ে গেছে। রাতদিন মাথায় ঘুরছে ওই চায়ের দোকানের গল্প। দাদা কখন দোকানে যায়, কি করে দোকানে, ছুটি পায় কোন কোন সময়, আর মাইনে পায় কতোটাকা। পান্নুর দাদা যে মাসের শেষে সাত টাকা মাইনে পায় আর মাঝে মাঝে তাকে বিনিপয়সায় চা খাওয়ায় রাজলক্ষ্মী কেবিনে, এ খবরটা খুব পুরোনো হয়ে গেছে তার কাছে। যতোবার পান্নুর সঙ্গে দেখা হবে প্রতিবারই তাকে এ-খবরটা শুনতে হবে ওর কাছ থেকে। আজো কিছুক্ষণ পরে পান্নুর মুখ থেকে এ-খবরটা আবার তাকে শুনতে হবে। তবু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাব এখন কেমন একটা কষ্ট হলো, কষ্টটা অনেকখানি যেন তার নিজেরই।

তার গলাটা একটু ধরে গেলো বলতে বলতে, আমারো তো একমাসের মাইনে বাকি পড়ে আছে রে। আমারো কি কম মুস্কিল! বাবা যে চট করে দিয়ে দেবে তাওতো মনে হচ্ছে না—

বাধা দিয়ে পান্নু বললো, আর আমার মুস্কিলের কথাটা একবার ভেবে ছ্যাখ—একেতো হাফ-ফ্রি, তার ওপর আবার তিন তিনটে মাস—দাদার কাছে চাইলেও পাবো না। দাদা তো আস্ত ছ'টা টাকা মার হাতে দিয়ে দেয়।

সে ভেবে পেলো না চট করে কি উত্তর দেবে।

পান্নু নিজেই আবার বললো—যাক শালা ছাড়িয়ে দিলে তো বেঁচেই যাই। আমারো আর ভালো লাগছে না। বাবা তো হপ্তায়

দুদিন বাড়ি আসবে, কিছু জানতেই পারবে না। মাকে বললেই হবে ইস্কুল যাচ্ছি। মা খোঁজও নেবে না, জানতেও পারবে না।

ঝুমকোদি ?

আরে ওই দিদিকে নিয়েইতো যতো গণ্ডগোল। ও ঠিক খোঁজ রাখবে কোথায় যাচ্ছি না-যাচ্ছি। সন্ধ্যে হলেই টিক টিক করবে, বই নিয়ে বসতেই হবে একবার। দিদির চোখকে ফাঁকি দেয়া ভীষণ শক্ত—কথাগুলো বলে পানু এমনভাবে তার দিকে তাকালো যেন সে এক্ষুণি একটা মতলব বলে দেবে।

অনিন্দ্যর শুধু মনে পড়লো একবার ছোড়দির কথা। ছোড়দিও কি ঠিক এইরকম। খালি টিকটিক করবে। সে স্কুলে গেলো কি গেলো না, তার খাওয়া হয়েছে কি হয়নি, সে বই নিয়ে বসেছে কি বসেনি—এ সব খবর ছোড়দির রাখা দরকার। অথচ তার নিজের একটি খবরও যদি কেউ জানতে পারে। মা তো রাতদিনই ছোড়দির সঙ্গে সঙ্গে আছে তবু কি মা জানতে পেরেছে ছোড়দির একটা কথাও। বাবা শুধু জানতে পারে একটু-আধটু।

ঝুমকোদির সঙ্গে ছোড়দির যে এমন মিল থাকতে পারে সে ভাবতেই পারেনি কোনোদিন। হঠাৎ যেন সে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলো। তবে কি ছোড়দি আর ঝুমকোদির মধ্যে কোনো তফাতই নেই ? দুজনেই ঠিক একরকমের। এতোক্ষণে মনে মনে একটু খুশি হলো। সে অন্যমনস্কে একটু হেসে ফেললো।

পানু জিজ্ঞাসা করলো, হাসলি যে—

না, এমনি। আচ্ছা এখন কোথায় যাওয়া যায় বলতো—

চল রাজলক্ষ্মী কেবিনে যাই। দাদা বোধহয় এখন ওখানে আছে, নিশ্চয় চা খাওয়াবে।

তার চা খাওয়ার ইচ্ছে মোটেই ছিলো না। পান্নু তবু তাকে জোর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। পান্নু এমন বড়দের মতো ভাবভঙ্গী করবে যে সে না-হেসে থাকতে পারে না। চা না-খেলে যেন তার এক্ষুনি শরীর খারাপ হবে এমনই ভাবখানা। একটু ভয়-ভয় করলো। বাবা এ-সময় ছুটির দিনে রাজলক্ষ্মীকেবিনে চা খেতে যেতে পারে। বাবা দেখে ফেললে আর রক্ষে নেই। তবু ওকে ছাড়তে যে তার ইচ্ছে করছে তাও নয়। পান্নু ভরসা দিলো আগে ভালো করে দেখেশুনে তারপর তারা ঢুকবে। চায়ের দোকানে গিয়ে আরেক বিপদ। দোকানে পান্নুর দাদা নেই। সে ভাবলো যাক বাঁচা গেলো। পান্নু দমবার ছেলে নয়। বললো, দাঁড়া একটু।

আর দাঁড়িয়ে কি হবে ? তোর কাছে পয়সা আছে ?

পান্নু চোখ টিপে ইসারায় দাঁড়াতে বললো তাকে। সে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে। পান্নু দোকানের ভেতর দিকে চলে গেলো। আরো যে সব ছেলেরা চা এনে দেয় তাদের একজনের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কি সব বললো, তারপর হাত নেড়ে ডাকলো তাকে। সে দোকানের ভেতর দিকে চলে গেলো। দুজনে একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলো দুখানা চেয়ারে।

একটি ছেলে এসে দুকাপ গরম চা রেখে গেলো টেবিলের ওপর। পান্নু চায়ের কাপে অল্প একটু চুমুক দিয়েই মুখ সরিয়ে নিলো। তারপর বার দুই তিন একইভাবে চুমুক দিলো। সে লক্ষ্য করলো ঠিক বড়োরা যেমনভাবে চায়ের কাপে চুমুক দেয় পান্নু ঠিক সেইরকম ভাবেই চুমুক দিলো চায়ের কাপে। তার আবার হাসি পেলো একটু। সে তাড়াতাড়ি প্লেটে ঢেলে কোনোরকমে চা-টা খেয়ে ফেললো। ভীষণ গরম চা। জিবই পুড়ে গেলো।

তার চা-খাওয়ার ভঙ্গী দেখে পান্নু তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো একটু। সত্যিকথা বলতে সে একটু লজ্জাই পেলো। তার মনে হলো সে যেন পান্নুর চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ। তার কাপে যখন আর এক ফোঁটাও চা পড়ে নেই, তখনো পান্নুর কাপে চা প্রায় ভর্তি। পান্নু যেন ভাবতেই পারেনি যে ওর চা-খাওয়া হয়ে গেছে। সে এবার বললো, এর মধ্যেই চা খাওয়া হয়ে গেলো তোর? গিলে ফেললি নাকি?

অনিন্দ্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, পান্নু বাধা দিয়ে বললো, যাক শোন, দরকারি কথা একটা। ইস্কুল ছেড়ে দিচ্ছি। আর ওর মধ্যে নেই। আজ খাতা নেই, কাল পেন্‌সিল নেই, তিন মাসের মাইনে পড়ে আছে। শালা, একখানা খাতার ওপর পেন্‌সিল তার ওপর কালি বুলিয়ে বুলিয়ে চালালাম স্রেফ তিনটে মাস। আর নয়, খুব হয়েছে। একটুখানি চুপ করলো পান্নু।

সে এতোক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করছিলো পান্নুকে। পান্নু কি রকম আশ্চর্য পাল্টে গেছে। এই দু-তিন বছরে পান্নু যেন অনেক বড়ো হয়ে গেছে। ঠিক বড়োরা যেমন করে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে ঠিক তেমনভাবে কথা বলবে। মাথার চুলগুলো ওপর দিকে উঁচিয়ে দেবে। খুব জোরে কথা বলতে বলতে যখন মাথার চুলগুলো কপালের দুপাশে এসে পড়ে তখন দুহাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে মাথার ওপর দিকে তুলে দেবে ঘনঘন। সত্যি না হেসে থাকতে পারে না সে।

পান্নুর এতোক্ষণে চা খাওয়া শেষ হলো।

সে ফের শুরু করলো, শঙ্করবাবুদের ড্রাইভারকে ভজিয়েছি অনেক করে বুঝলি, শালা অনেক দিন ধরে ঘুরছি ওর পেছনে।

ওদের একটা লোক লাগবে গাড়ি ধোয়া-মোছার জন্যে। দুখানা মস্ত গাড়ি বুঝলি, রোজ ধুতে হবে ভালো করে জল দিয়ে, মুছতে হবে, মুখ দেখা যায় এমনিভাবে পালিস করতে হবে। চাকার কাদা তুলতে হবে, ভেতরের গদি সাফ্ করতে হবে, ব্যশ আর কিছু নয়। মাসে মাসে দশ টাকা করে দেবে। এ-ছাড়া ফাঁকে ফাঁকে গাড়িও চাপা যাবে। মিথ্যে কথা বলবো না তোকে, শঙ্করবাবুদের ড্রাইভার অনেকদিন গাড়ি চাপিয়েছে আমায়। ওই তো লাগিয়ে দেবে বলেছে। শালা খোশামোদ কম করছি, হপ্তায় তিন-চার দিন চা খাওয়াই রাজলক্ষ্মী কেবিনে। বলেছে হয়ে যাবে। মাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে, আর যতখুশি খরচ করো নিজে, বল মন্দ হবে কিছু ?

তার দিকে তাকালো পানু এবার একদৃষ্টে।

নিশ্চয় কিছু একটা শুনতে চায় তার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো সে। তবু সে কিছু বলতে পারলো না। আরো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো পানুর দিকে। কি রকম বড়দের মতো গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলে ও।

আর দশ বছর পরে কি রকম হয়ে যাবে পানু, একবার ভাববার চেষ্টা করলো। এই দুবছর আগেও তো পানু কি রকম ছিলো। কি রকম ভীতু-ভীতু। বেশি কথা বলতে পারতো না, কেমন যেন ভালো ছেলে ধরনের। পানু যেন রোজ একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে। এখন কি রকম ডাকাবুকো আর চালিয়াৎ হয়ে উঠেছে। বড়দের মতো ভাবভঙ্গী করবে, কথাবার্তাও বলবে বড়দের মতো। সবচেয়ে দুঃখ হলো ভেবে, পানুও স্কুল ছেড়ে দেবে তার দাদার মতো ?

আচ্ছা স্কুলেরঅনেক ছেলেরই মাইনে বাকি পড়ে আছে, তারা কি করবে। তারা যদি সবাই স্কুল ছেড়ে দেয় তবে—সে ভাবতে পারে না। তার কেমন হাঁফ ঠেকে। তাহলে তো স্কুল একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। সেওকি তবে স্কুল ছেড়ে দেবে? পানুর দাদার মতো চায়ের দোকানে কাজ নেবে, কিম্বা পানুর মতো গাড়ি-ধোয়ার কাজ। না, গাড়ি সে ধুতে পারবে না। যতো বড়ো আর যতো ভালো গাড়িই হোক। কি রকম হ্যাংলা পানুটা। ভাবলেও তার সমস্ত শরীরটা রাগে জ্বলে ওঠে। সে বড়লোকের গাড়ি ধোবে? না, কিছুতেই না। মরে গেলেও সে পারবে না শঙ্করবাবুদের মোটর গাড়ির চাকা থেকে কাদা তুলতে। দরকার নেই তার গাড়ি চড়ে।

লেখাপড়া সে শিখবেই। স্কুল সে কোনোদিনই ছাড়তে পারবে না। স্কুল ছাড়লে ছোড়দি ভীষণ দুঃখ পাবে। ছোড়দিকে সে কষ্ট দিতে পারবে না। মারও কষ্ট হবে, তবে ছোড়দির মতো নয়। মা প্রথমটা একটু বকাবকি করবে, গালাগাল দেবে, তারপর বলবে, যা হোক একটা কাজ কম্মো কর বাবা, বসে থাকিসনে। তোর মতন অনেক ছেলে আজকাল রোজগার করছে।

না, শুধু ছোড়দির জন্যে সে স্কুল ছাড়বে না। সে লেখাপড়া শিখবেই, যেমন করে হোক সে শিখবে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, সে লেখাপড়া শিখবে, সে স্কুল ছাড়বেনা, ছাড়বেনা, ছাড়বেনা।

সে বই কিনবে। অনেক অনেক কবিতার বই, গল্পের বই ইতিহাসের বই। যা তার ভালো লাগে সে শুধু তাই কিনবে। নতুন নতুন বইগুলোর হলদে রংয়ের পাতা, ঝক্‌ঝকে কালো অক্ষরগুলো আর চক্‌চকে মলাট। সে বইগুলোর পাতার মধ্যে অনেক্ষণ মুখ গুঁজে গুঁজে নিশ্বাস নেবে। মনে মনে ভাবলেই কিসের একটা

গন্ধ তার নাকে ভেসে আসবে। বিশ্ববন্ধুদের বৈঠকখানায় যেমন করে সাজানো আছে বইগুলো তেমনি করে সাজিয়ে রাখবে বইগুলো। ধুলো ঝাড়বে, মুছবে, আর বইগুলোর গায়ে মাঝে মাঝে হাত বুলোবে। কিন্তু বই কিনতে গেলে যে অনেক পয়সা লাগবে? এ-কথাটা একবার মাথায় এলেই আবার দুঃখ পায়। কোথা থেকে পাবে সে এতো পয়সা? দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

পান্নু ইতিমধ্যে বার দুয়েক জিজ্ঞাসা করলো, কিরে কিছু বলছিস না যে। সে কোনো কথা বললো না দেখে নিজেও চুপ করে গেলো। দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো।

তারপর পান্নু আবার আস্তে আস্তে বললো, চল ছবিগুলো একবার দেখে আসি।

এও পান্নুর এক নেশা। সিনেমার নতুন কোনো ছবি এলেই পান্নু বাইরে টাঙানো ছবিগুলো কাঁচের ওপর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। পান্নুর পাল্লায় পড়লে তারো অনেকদিন উপায় থাকে না না-গিয়ে। আজ তার কিছু ভালো লাগছিলো না। সে রাজী হলো না। পান্নু যদি দুঃখ পায় দুঃখ পাক। সে আজ কিছুতেই যেতে পারবে না। পান্নু চলে গেলো। সেও ফিরলো আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে।

॥ ৫ ॥

সে যখন বাড়ি থেকে বেরুবে বেরুবে করছে, তখন দেখেছে ছোড়দি লেখার খাতার একখানা পাতা নিয়ে মাথার চুলে ঘষছে। মাথার তেল লেগে লেগে কাগজখানা যখন বেশ তেলাটে হয়ে আসবে অর্থাৎ কাগজখানা একখানা ছবির ওপর রাখলে ছবিখানা যখন স্পষ্ট দেখা যাবে কাগজের মধ্যে দিয়ে, তখন ছোড়দি পুরোনো খবরের কাগজ বা কোনো বইয়ের ওপর কাগজখানাকে রেখে খুব আস্তে আস্তে পেন্‌সিল দিয়ে তার ওপর একটা নক্সা তুলবে। তারপর সেটাকে কাপড়ের ওপর তুলে সেলাই করবে। খুব মনোযোগ দিয়ে ছোড়দি যখন এসব করছিলো সে পা-টিপে টিপে বাড়ির বাইরে চলে আসে। মাথায় একটু বেশি তেল মেখে ফেলেছিলো ছোড়দি। তেলে-জলে একরাশ চুল জব্‌জব্‌ করছিলো। কপালটার দুপাশটাতেও কেমন যেন তেল চকচক করছিলো। জামার পিঠের দিকটা একটু ফেঁসে-ফেঁসে গেছে। কাপড়ের আঁচলটা দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছিলো আর একমনে মাথা নিচু করে সেই মাথার-চুলে-ঘষা কাগজখানার ওপর কিসের একটা নক্সা তুলছিলো। ঠিক এরকম অবস্থায় ছোড়দিকে দেখে এসেছিলো সে। আর বাড়ি ফিরে সেই ছোড়দিকেই সে প্রায় একরকম চিনতে পারেনি প্রথমটায়।

ছোড়দিকে ফর্সা দেখাচ্ছিলো অনেক বেশি অন্যদিনের তুলনায়। চমৎকার করে পাউডার মেখেছিলো সারা মুখে। একটুও কালো মনে হয় না ছোড়দিকে দেখলে। মার বাক্সে-তুলে-রাখা অনেক দিনের পুরোনো নীল রং-এর একখানা সিল্কের কাপড় পরেছে।

বিশেষ কোনো জায়গায় গেলে এই কাপড়খানাই পরতে দেখেছে ছোড়দিকে সে বরাবর। আর এই কাপড়খানা পরলে একমুহূর্তে যেন ছোড়দির চেহারা পাল্টে যায়। কেন যে মাঝে মাঝে এক-আধবারও এ-কাপড়খানা পরে না সে বুঝতে পারে না। আর ছোড়দিরও ঠিক দোষ নেই সব সময়। যদি একদিন একটু ইচ্ছে করলো কাপড়খানাকে বার করে পরে, মা অমনি ছুটে আসবে, গলা ছেড়ে চীৎকার করে উঠবে, আর কি কাপড় পেলি না একখানা? ওখানার মাথা না-খেলে আর হচ্ছে না?

সত্যি কথা বলতে কি অনিন্দ্য অনেকদিন দেখেছে আর একখানা কাপড়ও থাকে না বাইরে বেরুবার মতো। আর বাইরে বেরুতে হলে ছোড়দি জানে (সেও জানে) ঐ একখানাই সত্যি ভালো কাপড় যা পরে দশজনের সামনে বেরুনো চলে। তবু মার কথাই থাকে। ছোড়দি সেদিনের মতো আর ও-কাপড়খানা বার করে না।

সে বার বার ছোড়দির দিকে চেয়ে দেখছিলো। হঠাৎ তার মনে হলো এ-ঘরটার মধ্যে ছোড়দিকে যেন কেমন বেমানান দেখাচ্ছে। ছোড়দি যেন অন্য বাড়ির মেয়ে, তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এক্ষুনি চলে যাবে। ছোড়দি যেন অরুদিদের বাড়িরই কেউ। অনেকদিন পরে হঠাৎ তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। তবু বেশিক্ষণ এমন ভাবতেও তার কেমন একটা কষ্ট হয়। ছোড়দি তার নিজের ছোড়দি নয়, এটা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না।

ব্যাপারটা কি সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। সে ছোড়দিকে না মাকে জিজ্ঞাসা করবে কথাটা সেটাও ঠিক করতে পারলো না।

ছোড়দি ভীষণ লজ্জা-লজ্জা আর ভয়-ভয় মুখ করে বসে ছিলো। এখন কিন্তু ছোড়দিকে দেখলে বুঝতেই পারবে না কেউ যে সে অমন কাজের মেয়ে। ঠিক মোমের পুতুলটি হয়ে বসে আছে। সে দেখলো এমনকি তার সঙ্গে কথা বলতেও ছোড়দির আজ কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করছে। আশ্চর্য হোলো ছোড়দিকে দেখে। ছোড়দিকে আজ বাড়ির একটা কাজও করতে দিচ্ছে না মা। দরকারি অদরকারি সব কাজই মা নিজে করে নিচ্ছে। ছোড়দি কাপড় জামা যাতে ময়লা না-হয় সেজন্যে চুপচাপ বসে আছে একপাশে মাদুরটা বিছিয়ে। মাথা নিচু করে অন্যমনস্কে ছেঁড়া মাদুরটা থেকে কাঠি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটছে, আর মাঝে মাঝে নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে মাদুরের ওপর।

ছোড়দির মুখের দিকে আরো একটু ভালো করে তাকিয়ে সে লক্ষ্য করলো ছোড়দির শুধু লজ্জা-লজ্জা নয় কেমন যেন রাগও হচ্ছে, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না। রাগে আর লজ্জায় মুখখানা অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে উঠেছে আর থমথম করছে। তারও মুস্কিল কম নয়, সে ছোড়দিকে এ-সময় কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারে না আবার তার নিজের অস্বস্তিও বেড়ে যায় এজন্যে।

এমন সময় মা নিজে এসেই বললো—শোন, আজ আর যেন এক্ষুনি আবার বাড়ি থেকে বেরুসনি। অরু ওরা এই এসে পড়লো বোধহয়। পারুলের সঙ্গে তুইও যা।

সে কোথায় যাবে ছোড়দির সঙ্গে আর অরুদিরাই বা আসবে কেন, এ-সমস্তর কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। সে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মা আবার বললো, গায়ের জামা কাপড়গুলো

খুলে ফেল। বিছানার ওপর একটা জামা কেচে রেখেছি, আর তোরঙ্গোর ওপর ছাখ একখানা ধুতি আছে।

মার শাড়ি যেমন ছোড়দির, তেমনি দরকারে অদরকারে বাবার ধুতিও। বাবা যেমন বেঁটে খাটো মানুষটি, সে ঠিক তার উল্টোটি। বয়সের তুলনায় বেশ, লম্বাই বলতে হবে। এও আরেক বিপদ। হাফপ্যাণ্টে কেমন অসুবিধে বোধ করে সে আজকাল।

কোথায় যাবে না-যাবে সে পরের কথা। যাক আগে তো গায়ের জামাটা ছাড়তে পারবে সে। নিজের ঘামের গন্ধে নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলো। অন্যসময় হলে এ-জামাটাই আরো কয়েকদিন গায়ে চাপিয়ে রাখতে হতো। আজ কি ভাগ্য মা নিজেই বললো জামা ছাড়ার কথা।

জামা-কাপড় ছেড়ে ছোটো আয়নাখানাকে কাৎ করে দেয়ালের গায়ে রেখে সে যখন মাথার চুলগুলো ঠিক করছে তখন আয়নায় নিজেব মুখ আর চেহারার একটুখানি দেখে তার হঠাৎই যেন মনে হলো পরিষ্কার জামা কাপড় পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তাকে তো খারাপ দেখায় না মোটে। অবশ্য ছোড়দির মতো অতো ভালো দেখায় না একথা সত্যি।

মার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, মুখ দেখে মনে হলো মা ভীষণ খুশি হয়েছে তাকে দেখে। মা নিজে চা-খাবার এনে দিলো। অন্যদিন মাকে জিজ্ঞাসা করে করে তবে সাড়া পায়। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করলে মা হয়তো গায়ে জল ঢালতে ঢালতে ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠবে কলতলা থেকে—মা মা—মা মরে গেছে। ঘোড়ায় সব জিন দিয়ে এসেছেন। মুখে মুখে তুলে না ধরলে রুচবে না। ছাখো কোথায় আছে, দেখেশুনে নিয়ে খাও—

শেষ পর্যন্ত কথাগুলো সব শোনা যায় না। জলের শব্দে মার গজগজ করার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া যাবে না। বেশির ভাগ দিনের ইতিহাস হচ্ছে এই।

সেই মা যখন কোনো কোনো দিন নিজে হাতে করে খাবার নিয়ে আসে তখন সে গোড়া থেকেই বুঝতে পারে আজ নিশ্চয় একটা সুদিন। না-হলে মার মেজাজ এতো সহজে ভালো থাকবার কথা নয়। আর আজ মা সত্যিই অন্যদিনের তুলনায় একটু ভালো খাবারই খেতে দিয়েছে। তার সঙ্গে গরম চায়ের কাপ।

এতোক্ষণে সে ভরসা পেলো একটু।

মা আরো কয়েকটা প্লেটে খাবার ঢেকে রাখছিলো। সে একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। তারপর বেশ একটু নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলো আস্তে আস্তে, আচ্ছা মা, আজকে কি ব্যাপার বলোতো ? হঠাৎ এতো খাবার-দাবার, আর অরুদিরাই বা হঠাৎ আজকে আসবে—ব্যাপার কি ?

মা ঠিক রাগ করলো না, আবার খুশি হয়েও যে কিছু বললো তাও নয়। কাজ করতে করতেই দায়সারা গোছের একটা উত্তর দিলো—কি দরকার তোর বলতো অতো কথায়। যা বলছি তাই কর। শোন, তাড়াতাড়ি চা-খাবার খেয়ে ছোড়দির কাছে গিয়ে একটু বস। অরুরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

সে বিরক্ত না হয়ে পারে না। কিছুতেই কি তাকে কেউ কিছু বলবে না। অন্যদিন হলে না-হয় ছোড়দিকেই জিজ্ঞাসা করতো। সে এবার মরীয়া হয়ে ছোড়দির কাছে উঠে গিয়েই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলো—কি ব্যাপার বলতো ছোড়দি, বলতেই হবে, না বললে কিছুতেই ছাড়বো না। মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, মা কিছু বললো না।

ছোড়দির হাতে সেই বইখানা। ও-খানা সে কালকেই বাবাকে পড়তে দেখেছে আবার। ছোড়দি খুব ঘন ঘন পাতা ওল্টাচ্ছে, মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যাবে একখানা পাতাও পড়ছে না। শুধু চোখের সামনে মেলে ধরে আছে বইখানা। আর ভাবছে অন্যকিছু। মুখ দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারে সে।

ছোড়দির হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো। এতোক্ষণ একা ছিলো যেন ভালোই ছিলো। সে একবার মনে মনে ভাবলো। তবু কথাটা জিজ্ঞাসা না-করে পারলো না। মুখ তুলে তাকালো একবার। একটু হাসলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ কষ্ট হলো। কেন সে জানে না। ছোড়দি মুখ নিচু করেই বললো, অরুদিদের ওখানে আমাদের যেতে হবে।

ভারি বিরক্তি লাগে। সেই এককথা। সে তো সে নিজেও জানে।

সে এবার একটু রাগ করেই জিজ্ঞাসা করলো—আরে বাবা, আমি জিজ্ঞাসা করছি—কেন ? কীজন্যে যেতে হবে।

তার রাগ করার ভঙ্গী দেখে ছোড়দিও না-হেসে থাকতে পারলো না। বললো—আমায় দেখবেন—অর্থাৎ অরুদিরা আমায় দেখাবে।

তার—মানে ?

তার মানে যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা, তিনি আমায় দেখবেন। অরুদিদের নিচের তলায় থাকেন, তাই অরুদিরাই নিয়ে যাচ্ছে।

হাসলো ছোড়দি কথাগুলো বলে।

এতোক্ষণে তার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। সব শুনে মনে হলো তার এটা মা আর অরুদিদের ষড়যন্ত্র। এক্ষুনি যেন ছোড়দির

বিয়ে না-হলে হচ্ছিলো না। কি দরকার ছিলো ছোড়দির এক্ষুনি বিয়ের জোগাড় করার। ছোড়দিকে বাড়ি থেকে না-তাড়ালে হচ্ছে না মার।

আর আছে ওই অরুদি। সর্বঘটে আছে। বিয়ে করতে হয় নিজে করুক না, অন্য লোকের জন্যে অতো মাথাব্যথা কেন, যতো নষ্টের মূল হচ্ছে মা, তার ফের মনে হলো। ছোড়দি তো মা'রই মেয়ে। মা যদি না বলে, আর কেউ কিছু বলতে পারে নাকি। আর ওই ভদ্রলোক। খুব ভালো করে না হোক সে তাকে যেটুকু দেখেছে তাতেই তার ভীষণ খারাপ লেগেছে। কি করে যে ওর সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হতে পারে সে ভাবতেই পারে না। মোটা কালো মতন, বোকা-বোকা চেহারা। দেখলেই হাসি পায়, না-হয় তো রাগ ধরে। তার ফিরে মনে হলো এ কেবল অরুদির মাথায় এসেছে। হাতের মুঠোর মধ্যে পেলে একবার দেখে নেয় সে অরুদিকে।

ভাবতে ভাবতে মনটা যখন রাগে গিসগিস করছে তখন বাইরে সত্যিই মোটর গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেলো। এক নিমেষে সমস্ত ভাবনা চিন্তা কোথায় গেলো। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাইরে চলে এলো। দেখে সত্যি সত্যি অরুদিরা এসে হাজির। মস্ত একখানা ট্যাক্সি। অরুদি প্রথম নামলো। তারপর পিছনে পিছনে শ্বেতাদি আর ওদের ছোট ভাই অঞ্জন।

চোখাচোখি হতেই অরুদি জিজ্ঞাসা করলো—কই, পারুল তৈরী হয়ে নিয়েছে? তুইও তো যাবি—

সে কিছু একটা বলবার আগেই অরুদিরা সব বাড়ির মধ্যে এসে হাজির। মা কোথায় যেন ছিলো, এতোগুলো গলার হৈ-হৈ শুনে ছুটে এলো।

ময়লা আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললো—তোরা সব একটু বসে যাবি না—একটি বস।

অঞ্জনকে হাত ধরে মা বসালো। অঞ্জন আলতো হয়ে মাদুরের ওপর ছোড়দির একপাশে বসে পড়লো। অরুদি আর শ্বেতাদি দাঁড়িয়েই রইলো।

অরুদি সিল্কের রুমালখানা দিয়ে চশমার চারপাশটা পুছতে পুছতে বললো, না মাসিমা, এক মিনিটও না। তোমাকে তো বলাই ছিলো, তোমার মেয়েকে এখান থেকে তুলে নিয়ে স্ট্রেট ওখানে যাবো—আর কতোক্ষণেরই বা মামলা—

তা হোক। একটু বসে না-গেলে কি হয়? চা-টা একটু করে রেখেছি, খেয়ে যা।

অরুদি আর শ্বেতাদি মুখ চাওয়াচায়ি করলো। অঞ্জন এ-সময়টা দিদিদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। সে লক্ষ্য করলো।

শ্বেতাদিই হেসে বললো, না মাসিমা, আমরা থাকতে তোমার চা খাবার ফেলা যাবার কোনো কারণ দেখছি না।

মা তার দিকে চেয়ে একটু হাসলো। সে বুঝলো মা সত্যি শ্বেতাদির কথায় খুশি হয়েছে।

অরুদি এসব কথার কোনো কিছু কানে তুললো না। ছোড়দির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মার দিকে ফিরে বললো, সিল্কের রুমালখানা হাতের কব্জিতে বাঁধতে বাঁধতে—আচ্ছা মাসিমা একটা কথা বলবো, যদি রাগ না করো তো বলি, তোমার মেয়ে অমন পেঁচার মতো মুখ করে বসে আছে কেন বলো তো? যেন কাঠগড়ার আসামী।

মা বললো—ও-মেয়ের কথা আর বলো না। চিরটাকাল অমন গুজগুজে।

সে বুঝতে পারলো অরুদিকে খুশি করবার জন্যেই মা এই মিথ্যে কথাটা বললো। এমন কেউ নেই যে ছোড়দির সুখ্যাতি করে না। অরুদির চেয়ে যে ছোড়দি অনেক ভালো কথা বলতে পারে এটা একদিন সে ভালো করেই অরুদিকে টের পাইয়ে দেবে। তার একেক সময় মনে হয় সত্যি সত্যি শ্বেতাদি কিছুতেই অরুদির বোন হতে পারে না।

মা ইতিমধ্যে একেক করে খাবারের প্লেটগুলো নিয়ে এলো। চায়ের কাপ নিয়ে যাবার জন্যে ডাকলো তাকে। সাবধানে সে দুহাতে দুটো চায়ের কাপ এনে নামিয়ে রাখলো মেঝেতে। আজ সকালেই কেন-যে মা তাকে একজোড়া পরিষ্কার কাপ-ডিস আনতে বলেছিলো সে বুঝতে পারলো এতোক্ষণে। রাজলক্ষ্মী কেবিনের কাপডিস সে চেয়ে এনেছিলো পান্নুর কাছ থেকে। পান্নু অবিশ্যি তার দাদার কাছ থেকেই চেয়েছিলো।

শ্বেতাদি এবার ধপ করে বসে পড়লো অঞ্জনের পাশে। নিজেই চায়ের কাপ আর প্লেটটা এগিয়ে দিলো অঞ্জনের দিকে। তারপর মার দিকে তাকিয়ে বললো—এটা কিন্তু তোমার ঠিক হলো না মাসিমা। খাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু একসঙ্গে সারা উচিত। বলো অন্যায় কিছু বলেছি।

কথাগুলো বলে শ্বেতাদি এমন করে মার দিকে তাকালো, যে মা সত্যিই না-হেসে থাকতে পারলো না।

অঞ্জন খুঁটে একটুআধটু খেলো। শ্বেতাদি কিছু ফেলে রাখলো না। আর অরুদি যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়েই

রইলো। বসলো না, এমন কি নড়েনি পর্যন্ত একপা নিজের জায়গা থেকে।

শ্বেতাদি বললো, দিদি তোর চা-টা যে একেবারে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

তার কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে অরুদি ফের মা-র দিকে তাকিয়েই বললো, শোনো মাসিমা, মেয়ের হয়ে যেন লড়াই কোরো না আবার। আমি বলছি কি আমার খাবারটা আর চা-টা তোমার মেয়েকে দাও। ওরই খাওয়ার দরকার। যা নার্ভাস তোমার মেয়ে। আর বলাইদার কাছে ইণ্টারভিউ—চেহারাখানা দেখলেই তো ঘাবড়ে যেতে হয়—

মা একটু ম্লান হেসে বললো, মেয়ের হয়ে লড়াই করবার মতো কি শক্তি আর আছে, তাহলে না-হয় লড়াই করতুম, আর না আছে ছাই পয়সা। এখন ভালোয় ভালোয় বিদেয় করতে পারলে বাঁচি—আর তোমরাও তো চেষ্টার ত্রুটি কিছু করছো না।

মার কথাগুলো তার খুব খারাপ লাগলো। কেন জানে না। অরুদির দিকে চোখ পড়তেই দেখলো অরুদি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শ্বেতাদি সমানে তাকিয়ে ছিলো মা'র মুখের দিকে। মার কথাগুলো ভালো করেই শুনছিলো।

অরুদি ঘড়ির ওপর থেকে চোখ তুলে তাকালো মার দিকে। তারপর বললো, আর একটি মিনিটও না মাসিমা, এই শ্বেতা উঠে পড়। নাও পারুল ওঠো—চেহারাটা একবার দেখে নিতে পারো—নার্ভাস হবার কিছু নেই—

ছোড়দির দিকে এবার তাকালো সে। ছোড়দি মাথা নিচু করেই উঠে দাঁড়ালো, তারপর অরুদির দিকে চেয়ে বললো,

কতোক্ষণে ছাড়বে অরুদি ? বেশি দেরি কোরো না কিন্তু ভাই—

সেটা কি আমার হাতে নাকি ?

অরুদি আরেকবার তার হাত ঘড়ির দিকে তাকালো, তারপর বললো, তবে মনে হয় হাফ্-এন আওয়ারের মধ্যেই ঢুকে যাবে।

আচ্ছা আমরা উঠলুম মাসিমা।

ওরা সবশুদ্ধ ট্যাক্সিতে এসে উঠলো।

যখন অরুদিদের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলো তখন বিকেল একেবারেই পড়ে গেছে।

দরজা দিয়ে ঢুকে নিচের তলায় সামনে যে ঘর তিনখানা, সেখানেই বলাইবাবুরা থাকেন। অনেকদিন আগে কি-একটা কাজে সে এখানে এসেছিলো। দরজার মুখেই দেখেছিলো বলাইবাবুকে। সেই প্রথম। তারপর আজ আবার দেখলো। আরো যেন বেশি কালো আর মোটা মনে হলো তার বলাইবাবুকে। এমন গম্ভীর মুখখানা যে দেখলেই মনে হয় সর্বদা রাগ করে আছেন। অনেক সময় হাসলেও মনে হয় হাসছেন না।

দরজার মুখেই ছিলেন বলাইবাবু। অরুদি ছিলো সকলের আগে। অরুদিকে দেখেই বলাইবাবু একটু পিছন দিকে সরে গেলেন, তারপর বললেন, এসো এসো অরু। আমি তো তোমা-দেরই জন্যে বেরুতে পারছি না এতোক্ষণ। তোমাদের আসার কথা কিন্তু আরো আধঘণ্টাখানেক আগে। একটু বেশি দেরি করে ফেলেছো অস্বীকার করলে চলবে না।

আর বোলো না বলাইদা—কোনো কাজ কি প্ল্যান করে করবার উপায় আছে। যতো বেশি পাংক্‌চুয়াল হবার চেষ্টা করি ঠিক ততো দেরি হয়ে যাবে। যাক আর বাজে কথার দরকার নেই, তোমার সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দিই—(অরুদি ছোড়দির দিকে তাকালো একবার) শ্রীপারুল রায়—আমাদের সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি।

তারপরে তার হাতধরে সামনের দিকে আস্তে টেনে আনলো, সে দাঁড়িয়ে ছিলো একেবারে পিছনে।

এই হচ্ছে আমাদের নেক্‌স্ট ইম্‌পরট্যাণ্ট গেষ্ট—অনিন্দ্য রায়।

বিশ্রী লাগে অরুদির এই ভাবটা। কি রকম যেন ন্যাকার মতো উচ্চারণ করবে ইংরেজি কথাগুলো, আর ইংরেজি যেন বলা চাই-ই। তবু যদি সত্যি ইংরেজি জানতেন—ছোড়দির দেখাদেখি সেও হাত তুলে নমস্কার করলো বলাইবাবুকে।

সামনের ঘরখানায় খানকয়েক চেয়ার পাতা। একপাশে একটা আরামকেদারা। দেয়ালের গা-ঘেঁষে আছে একটা বইয়ের সেল্‌ফ। দু চারখানা ছবি আর খান দুয়েক ক্যালেণ্ডার ছাড়া আর কিছু নেই ঘরে। বেশ পরিষ্কার ঘরখানা সে লক্ষ্য করে দেখলো।

ছোড়দির ঠিক পাশেই একখানা চেয়ারে বসলো সে। অরুদি ও-পাশের আরাম কেদারায় শুয়ে পড়েছে। মাথার ওপর পাখাটা সমানেই চলছিলো। অরুদি বলাইবাবুকে বললো, বলাইদা পাখাটা একটু জোর করে দাও তো। আমরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দেয়া উচিত ছিলো।

সত্যিই আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো, বলে বলাইবাবু সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে বেশ জোর করে দিলেন পাখার গতি।

তারপর কোণের দিকে একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অঞ্জন এতোক্ষণে উঠে ওপরে চলে গিয়েছিলো। অঞ্জন চলে যেতে একটু অসুবিধে হচ্ছিলো তার। কারণ, সে-ই তবু প্রায় তার সমবয়সী ছিলো।

এমনি সময় ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রমহিলা। সাদা থান কাপড় পরে আছেন। তাঁকে দেখেই বুঝতে পারা গেলো তিনিই বলাই বাবুর মা। বলাইবাবুর মাকে এর আগে সে কখনো দেখেনি। অরুদিদের মুখে তাঁর কথা শুনেছিলো। বলাইবাবুর মা কিন্তু বলাই বাবুর চেয়ে অনেক ফর্শা। খুব বড়ো বড়ো চোখ তাঁর। আর সেই চোখের ওপর সোনালী ফ্রেমের চশমা। ভারি সুন্দর দেখায় বলাইবাবুর মাকে চশমা পরে থাকলে। সে অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলো। হঠাৎ তাঁর চোখ যেই এসে তার ওপর পড়েছে সে চোখ নামিয়ে নিলো। তারপর যেই তিনি অরুদির মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে শুরু করলেন সে ফের তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে।

আচ্ছা অরু তোমরা যে এলে, একটা খবর দিতে হয় তো আমাকে। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ হলো এসেছো।

না মা। আসবার কথা অনেকক্ষণ আগে অবিশ্যি, কিন্তু এসেছে এই কিছুক্ষণ হলো। বলাইবাবু বললেন।

যাক ও-কথা, তোমরা নিশ্চয় চা খাবে তো, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চায়ের ব্যবস্থা করতে পারি ? তিনি প্রশ্ন করলেন অরুদির দিকে চোখ তুলে।

সে কথা আর বলতে মাসিমা। আমি তো চোখ তুলতে পারছি না। মাথা খসে গেলো একেবারে—অরুদি চশমাটা খুলে কপালের দুপাশটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে।

সে বুঝতে পারে না। এতোই যদি মাথা ধরেছে তো তাদের ওখানে চা-খেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো।

বলাইবাবুর মা চলে যাচ্ছিলেন এময় সময় শ্বেতাদিই আবার ডাকলো তাঁকে।

শোনো মাসিমা, এতোগুলো লোকের চা কিন্তু তোমায় আবার কষ্ট করে করতে হবে না। আমরা পারুলদের ওখান থেকে আচ্ছা করে খেয়ে এসেছি।

কই আমাকে তো সে কথা কিছু বলোনি। তবে আমার অনেক-খাটুনি বেঁচে গেলো বলো, বলে তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সে একবার আড়চোখে দেখে নিলো অরুদিকে। অরুদি হেলান দিয়ে বসে ছিলো ইজিচেয়ারটায়। এবার সামনের দিকে ঝুঁকে এসে বললো—আচ্ছা বলাইদা আজতো অনেকে আছি, সিনেমায় গেলে কেমন হয় ?

আবার সেই সিনেমা ? তার মনটা অজান্তেই বুঝি খারাপ হয়ে আসে।

যাক বলাইবাবু বাঁচালেন। তিনি বললেন, আজ কি আর টিকিট পাওয়া যাবে, আর তাছাড়া আকাশটাও কী রকম কালো হয়ে আসছে।

জানালার মধ্যে দিয়ে চেয়ে দেখলো সে। আকাশটা সত্যি সত্যিই বেশ কালো হয়ে উঠেছে। তবু ভালো। মেঘ করুক, বিষ্টি পড়ুক, তাও ভালো। সিনেমা যেন না-যাওয়া হয় শেষ পর্যন্ত, সে প্রার্থনা করে। তার আর ভাবনা রইলো না। বিষ্টি এসে গেলো। তার লাফ দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো।

ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের জোর আলো এসে খানিকটা চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। ছোড়দির দিকে চেয়ে সে হাসি চাপতে পারলো না। এতোক্ষণ সমানে মুখটি বুজে হাতপা গুটিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো। হঠাৎ দুহাত দুকানে চেপে ধরে বাইরে জানালার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে রইলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কড়্ কড়্ করে মেঘ ডেকে উঠলো গুমরে গুমরে। না-হেসে থাকতে পারে না সে। ঠিক বাড়িতে থাকলে যেমন ভঙ্গীতে চমকে উঠবে ছোড়দি বিদ্যুৎ চমকালে, তেমনি করেই চমকে উঠবে বাড়ির বাইরে যেখানেই থাক না কেন।

শ্বেতাদি বললো, সত্যি কি ছেলেমানুষ তুই পারুল।

ছোড়দি এতোক্ষণে লজ্জায় ঘেমে উঠেছে। বেশ বুঝতে পেরেছে (অনিন্দ্য অনুমান করে) এটা বলাইবাবুদের ঘর। সত্যি বেচারার দিকে চাইতেও কষ্ট হচ্ছিলো।

এমন সময় বলাইবাবু জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ওঠো ওঠো অরু শীগগীর, তোমার মাথার দিকে জানালাটা বন্ধ করে দাও— একেবারে ভিজে গেলো ঘরটা—ফের বাঁচালেন বলাইবাবু। ছোড়দি তবু এবার মাথাটা একটু তুলতে পারবে। অরুদি উঠে জানালাটা বন্ধ করতেই ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেলো। এ-সময়ে ঘরে ঢুকলেন বলাইবাবুর মা। হাতে তাঁর মস্ত এক থালা।

দে দে আলোটা জেলে দে, তাড়া দিলেন তিনি।

শ্বেতাদি তাড়াতাড়ি উঠে আলোটা জেলে দেয়।

আলোয় দেখবার আগেই থালায় কি আছে গন্ধে টের পায় সে। মাছ কি মাংসের কিছু একটা ব্যাপার। সে জোর করে টেনে টেনে গন্ধ নিলো।

এবার তার থালার দিকে চোখ পড়লো। বেশ বড়ো বড়ো চপ তৈরী করে এনেছেন বলাইবাবুর মা। খুশি না-হয়ে থাকতে পারে না, সত্যি সত্যি জিভে তার জল এসে গেছে।

অরুদির দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তোমারই তো সবচেয়ে বেশি ক্ষিধে, চটপট উঠে এসো।

তারপর তার দিকে ফিরে বললেন, তোমার মুখ দেখে কিন্তু একটা কথা বুঝতে পেরেছি, বলবো? আচ্ছা নাও বলবো না, লক্ষ্মী ছেলের মতো এদ্দিকে এসো আগে।

সে এতোক্ষণে সত্যি করে লজ্জা পেলো। বলাইবাবুর মা কি করে বুঝলেন চপ তার ভালো লেগেছে, চপের গন্ধে তার জিভে জল এসে গেছে। সত্যি সে মুখ তুলতে পারে না।

বলাইবাবুর দিকে চেয়ে ফের তিনি বললেন, আচ্ছা বলাই তুই বরং হাতে হাতে তুলে দে না; সবাই এসে তুলে তুলে নেবে, তাতে অসুবিধে হবে না?

তাতে আমার তো সুবিধে হবে না। সবাইকে দিয়ে নিজের জন্যে যখন তুলতে যাবো তখন দেখবো আর একখানাও পড়ে নেই— বললেন।

বলাইবাবুর মা না-হেসে থাকতে পারলেন না। সেও না-হেসে পারলো না। দেখলো ছোড়দি আর শ্বেতাদিও হাসছে।

নেহাৎ মন্দ লাগলো না তো বলাইবাবুকে আজ তার। কিন্তু কতোখানি ভালো লাগলো বলাইবাবুর মাকে তা সে কাউকে বোঝাতে পারবে না। ভীষণ ভালো লেগেছে তার বলাইবাবুর মাকে। মা'র কাছে গিয়ে আগে সে বলাইবাবুর মা-র গল্প করবে।

আচ্ছা ছোড়দির সঙ্গে যদি বলাইবাবুর বিয়ে হয় তো খারাপ

কি ? বলাইবাবুর মা তাহলে নিশ্চয় তাদের বাড়িতে আসবেন। আর বলাইবাবুদের বাড়ি সে যখন আসবে ছোড়দির সঙ্গে দেখা করতে, তখন কি আর বলাইবাবুর মা চপ তৈরী করে খাওয়াবেন না ? নিশ্চয় খাওয়াবেন। আর তখন সে লজ্জা করে খাবে না কি ? ভালো লাগলে চেয়ে খাবে। আর তখন ছোড়দি ? ছোড়দি কি তাকে জোর করে খাওয়াবে না ? বলাইবাবু তার খাওয়া দেখে ঠাট্টা করবেন। সে কানই দেবে না বলাইবাবুর ঠাট্টায়। বলাইবাবু তো আর একা থাকবেন না তার সামনে, ছোড়দিও নিশ্চয় থাকবে।

ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গেছে খেয়াল নেই তার, এমনি সময়ে মাথা তুলে দেখে ছোড়দি ওরা সব চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বলাইবাবুর মা অরুদির দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে অরু এই কথা রইলো। ওদের নিয়ে তুমি শীগগির আরেকদিন আসছো। ভালো করে কথা বলা হলো না—তাড়াহুড়ো আর যা বিষ্টি লেগেছে, ওদের মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি, খালি উঠি-উঠি করছে মন্ত্র, বলো করছে না ? বলে তিনি তাকালেন তার দিকে।

সে চোখ নামিয়ে নিলো তাঁর চোখ থেকে। বলাইবাবুর বাড়ি থেকে ওরা যখন বেরুলো, তখনো বিষ্টি ধরেনি। টিপ টিপ করে বিষ্টি পড়ছে, কিন্তু আকাশটা তেমনি কালো হয়ে রয়েছে। বাড়ির কথা মনে আসতেই মনটা কেমন চুপসে যায়। সে-ই বাড়ির মধ্যে এখন তাকে যেতেই হবে। মা আধময়লা ভিজে কাপড়গুলো মেলে দিয়েছে ঘরের মধ্যে। হ্যারিকেনের আলোয় এ-রকম অবস্থায় ঘরটাকে আরো ছোট দেখাবে। ভিজে কাপড়ের

গন্ধে ঘরটা আরো গুমোট হবে। একে দেয়ালগুলো কালিপড়া তার ওপর কাপড়ের ছায়া পড়ে আরো অন্ধকার দেখায় ঘরখানাকে। যদি রাস্তার দিকের •জানালাটা খোলা থাকে তো তার ছেঁড়া বইগুলো সব ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। মা অনেকদিন ভুলে যায় জানালাটা বন্ধ করে দিতে। আজো হয়তো ভুলে যাবে, কে জানে। এই বিষ্টির দিনগুলো অসহ্য ঠেকে তার কাছে। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুক ঠেলে কান্না আসে। ওই বিচ্ছিরি ঘরটার মধ্যেই তবু আজ সে স্বপ্ন দেখবে বলাইবাবুর মাকে। ঘুমের মধ্যে সে বলাইবাবুর মার সঙ্গে কথা বলবে আবার। সে দেখেছে যাদের ভালো লাগে তাদের সে স্বপ্নে দেখতে পায়। অরুদিকে সে আজ পর্যন্ত একদিনও স্বপ্নে দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

অরুদিকে যদি বা তার সহ্য হয় মাঝে মাঝে, তাদের ওই বাড়িটাকে তার সহ্য হয়না একটুও। মার মুখে ও-বাড়ির কথা শুনেছে সে। মা বলে, আগে তারা যে-বাড়িটায় থাকতো সেটার মাথায় নাকি ছিলো টিনের ছাদ। গরমের চোটে মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো আর কি। বাড়িটা ছাড়ার জন্যে বাবাকে পাগল করে দিয়েছিলো।

মা বলে—ও-বাড়িতে তুই তখন সবে বছর খানেক হয়েছিস, তোকে নিয়ে, আর পারুলই বা কতটুকু, আমার প্রাণ যায়যায়। তোর বাবাকে বলে বলে শেষটায় এ-বাসায় এলুম।

মার মুখ থেকে শুনেছে, সেবার বোমার ভয়ে সবাই যখন কলকাতা ছেড়ে পালালো, কলকাতা যখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, তখন কোথা থেকে বাড়ির ভাড়া কমতে লাগলো, জলের মত সস্তা হয়ে এলো বাড়িভাড়া। এ-বাড়িটায় যারা ছিলো তারা তখন কোথায় গিয়েছিলো কলকাতা ছেড়ে। তারপর তার বাবা খবর নিয়ে জানতে

পারলো, এ-বাড়ির লোকেরা এ-বাসাটা ছেড়ে অন্য কোথায় বাড়ি বদল করেছে। বাবা খুশি হয়ে একদিন মাকে জানালো, শেষ পর্যন্ত বাড়ি পাওয়া গেছে। মা বলে অমন খুশি নাকি মা জীবনে হয়নি। বাবা বললো, ভাড়া নাকি মোটে সতেরো টাকা। সে এখন ভাবে কুড়ি টাকা দিলে কি বাবা এর চেয়ে আরো অনেক ভালো বাড়ি পেতো না?

পরে শুনেছে কেমন করে এখান থেকে ছোড়দি স্কুলে ভর্তি হলো। আর স্কুলে ভাব হলো তার সঙ্গে প্রথমে বসুন্ধরার। ছোড়দির সঙ্গে বসুন্ধরার খুব আলাপ হয়েছিলো। কথায় কথায় জানতে পারলো ছোড়দি বসুন্ধরা, তার দিদি, বাবা আর এক ভাই নাকি ছিলো এ-বাড়িটায়। যুদ্ধের সময় বসুন্ধরার বাবা কি একটা ছোটো-খাটো ব্যবসা করছিলেন। তাই থেকে লাভও হয়েছিলো যথেষ্ট। তিনি পরে কলকাতার কাছাকাছি কোথায় বাড়ি করে উঠে যান। বসুন্ধরাও স্কুল ছেড়ে দেয়। ছোড়দি তারপরও অনেকদিন পড়েছিলো। এই বসুন্ধরাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো ছোড়দির সঙ্গে শ্বেতাদির।

শ্বেতাদি অবিশ্যি ভালোই ছিলো লেখাপড়ায় ছোড়দির চেয়ে। তবু তার মুখে সব সময়ে ছোড়দির প্রশংসা শুনেছে। একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলো শ্বেতাদি—জানিস পারুল তোর ওপর দিদি অমন চটা কেন? তোর গলায় একটা বাঁশি আছে কিনা, তুই কথা বললেই সেটা পিঁ-পিঁ করে বেজে ওঠে—

বসুন্ধরা একদিন গল্প করতে করতে বলেছিলো ছোড়দিকে, আমার দিদিকে তো তুই দেখেছিস, দেখিসনি?

ছোড়দি ঠিক মনে করতে পারেনি। তবু বোধ হয় মাথা নেড়েছিলো।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দিদি, উৎসাহিত হয়ে মাথা নেড়ে বলেছিলো বসুন্ধরা—খুব ভালো ছবি আঁকতো, এখন ছেড়ে দিয়েছে। তোদের ঘরের রাস্তারদিকে যে জানলাটা তার কোণের দিকের দেয়ালটায় দেখিস, এখনো বোধ হয় আছে, দিদির একটা আঁকা ছবি।

ছোড়দি আর সে দুজনেই দেখেছে, সত্যি সত্যিই ও জায়গাটায় একটা ছবি আছে। মোটা কালি দিয়ে কে এঁকেছে। একটা জাপানী বিমান থেকে বোমা ফেলছে আর নিচে অনেকগুলো খোলার চালের মাথায় আগুন লেগে গেছে। ভারি চমৎকার ছবিটা।

সে আজো জানে না সত্যি ওটা বসুন্ধরার দিদির আঁকা কিনা।

॥ ৬ ॥

বাবা এর মধ্যে আরেক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলো। কাঁপতে কাঁপতে একদিন খুব বেশি জ্বর নিয়ে ফিরলো সন্ধ্যেবেলা। মা'র তো মুখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেলো। কি করবে না-করবে ভেবে পায় না মোটে। এ-রকম কেঁপে জ্বর যে বাবার আগে আসেনি তাতো নয়, কিন্তু এবার মা উপায় করবে কি। যা দুচার পয়সা বেশি থাকে তো বাড়িতে লোকজন এলে আর রক্ষে নেই। এমনিতেই এখান থেকে ওখান থেকে নিয়ে চালাতে হয়। তার ওপর অসুখ বিসুখ হলে তো কথা নেই। মা'র এ-সময়কার অবস্থা দেখে তার আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় সবাইকে ফেলে অনেক দূরে কোথাও ছুটে পালিয়ে যায়। তারপর বাবার অসুখ যখন সেরে যাবে, পুরোনো ময়লা কালিপড়া দেয়াল-গুলোয় আবার কলি ফেরানো হবে, ঘরটায় হ্যারিকেনের আলো আর মিটমিট করছে মনে হবে না, বিষ্টি পড়লে দেয়াল বেয়ে বেয়ে জল পড়ে ঘর মাঝরাত্তিরে ভাসিয়ে দেবেনা, তখন সে বাড়ি ফিরে আসবে। মাকে দেখবে, মা পরিষ্কার কাপড় পরেছে ময়লা কাপড় ছেড়ে রেখে। দেখবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছোড়দির মুখটা ফুলে গেছে, তাকে একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না, ছোড়দির গা থেকে খুব চেনা-চেনা একটা সাবানের সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে। বাবাকে দেখে চিনতেই পারবে না প্রথমটায়, বাবা অনেক মোটা হয়ে গেছে, পরিষ্কার ধবধবে পাঞ্জাবী পরে রয়েছে। দাড়ি কামিয়ে মুখখানা আরো ফরসা দেখাচ্ছে।

এই বাবা যখন জ্বরের ঘোরে ময়লা বিছানায় শুয়ে ছটফট করে

তখন সত্যি তার ভীষণ কষ্ট হয়। এর ওপর বর্ষা-বাদলার দিনে যদি দেয়াল বেয়ে ঘরে জল পড়তে থাকে তো বাবার বিছানা আবার টানা হ্যাঁচড়া করে অন্য একপাশে সরিয়ে দিতে হবে।

সে হাঁপিয়ে ওঠে, কেন তাদের এতো কষ্ট তা বুঝতে পারে না।

তাকে এখান থেকে ওখান থেকে টাকা চেয়ে আনতে হবে বাবার চিঠি নিয়ে।

মা ঘরে ঢুকে মাঝেমাঝে ডানহাতটা বাবাব কপালের ওপর চেপে ধববে, তারপব ছোড়দির দিকে তাকিযে বলবে, জ্বরটা নেমে গেছে বোধ হয়, দেখদিকি একবার তুই এসে।

দাঁড়াও মা থার্মোমিটারটা একবার বার করি।

না আর থার্মোমিটারে দরকার নেই, ওতে তো রাতদিনই জ্বর উঠে আছে, মা বলে।

বাবা এ-সময় ইসারায় জল চায় ছোড়দির কাছে। বড্ড লাল দেখায় বাবার চোখ দুটো। সে তাকাতে পারে না বাবার চোখেব দিকে।

ছোড়দি যেই জল আনতে চলে যাবে, মা বাবার খুব কাছে ঘেঁসে এসে বলবে, দুচার লাইন যা হোক লিখে দাও, ও গিয়ে (অনিন্দ্যকে দেখিয়ে) একবার চেষ্টা করে দেখুক। পাঁচ দশটাকাও যদি দেয়।

তারপর তার দিকে ফিরে বলে, যা একটু কাগজ পেন্সিল আন দিকি।

সে একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল এনে বাবার হাতে দেয়। বাবা কাঁপা হাতে লিখে দেয় দুচারটে লাইন।

তারপর মা-ই তাকে বুঝিয়ে দেয় কি করতে হবে। ছোড়দি ইতিমধ্যে জল এনে হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। সে মস্ত বড় বড়

চোখ দুটো মেলে শুধু বাবার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ জোরে কাঁপে হাত দুটো লিখতে লিখতে।

বাবার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে সে যে এই প্রথম টাকা আনতে যাবে তা তো নয়। এর আগেও গেছে বহুবার। কখনো টাকা নিয়ে ফিরেছে, কখনো-বা শুধু হাতে ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ বসে বসে শুকনো মুখে। বাবার চিঠি নিয়ে সে গেছে একটি ছেলের বাড়ি, যাকে তার বাবা পড়িয়েছে কিন্তু টাকা পায়নি। আজ নয় কাল করে শেষ পর্যন্ত অনেকদিন হয়ে গেছে। তবু টাকা পাওয়া যায়নি।

সেখানেই আবার চেষ্টা করে দেখতে হয়। যদি দেয় কিছু টাকাও বাবার অসুখ করেছে বললে। চিঠি নিয়ে সে-বাড়ির ঠিকানায় যায়। লজ্জা আর ভয়ে পা কেমন যেন জড়িয়ে যায় তার।

কাকে চাই—ঢুকতেই বৈঠকখানা থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ আসে।

বাঁদিকের আর ডাইনের দুটো ঘরেরই দরজা খোলা। একটা ঘরে ফরাসের ওপর কতকগুলো বই ছড়ানো, কিন্তু কেউ নেই। আরেকটা ঘরের মধ্যেও চোখ দিলো সে, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। এইবার গলার স্বর আরো জোর মনে হলো তার—এই যে, এদিকে ওপরে—

সামনের ফাঁকা উঠোনটার ওপরের দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়লো দোতলার বারান্দার দিকে। সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। খালি গায়ে তবে পরনের ধুতির কোঁচাটা গলার ওপর দিয়ে আলতো করে জড়ানো। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে প্রায় আমতা-আমতা করে বলে ফেলে, আমি পরমেশ্বরবাবুর কাছ থেকে আসছি।

ভদ্রলোক যেন প্রথমটা একটু অবাক হয়ে যান। তারপরই সামলে নিয়ে বলেন—ওই যে ওই, ওদিককার ওই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে এসো—

প্রায় দু তিনটে জায়গা থেকে সিঁড়ি উঠেছে। কোনটা দিয়ে গেলে যে তাঁর কাছে পৌঁছানো যাবে বুঝতে পারে না সে। তাকে ইতস্তত করতে দেখে তিনি একটু ঝুঁকে আসেন আরো। তারপর বারান্দার নিচে সিঁড়ির দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন। এবার সে প্রায় একলাফে উঠে আসে সিঁড়ি দিয়ে।

বাবান্দাটা বেশ চওড়া। সেখানে দুচারখানা বেতের চেয়ার পাতা। ভদ্রলোক তাকে প্রথমে বসতে বললেন একখানা বেতেব চেয়ার দেখিয়ে, তারপর নিজেও বসলেন। সে বাবার চিঠিখানা তাঁর হাতে দেয়।

চিঠিখানাব ওপব একবাব চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোক তার দিকে চেয়ে বলেন, আমাব তো মনেই ছিল না কিছু—এতকাল উনিও কিছু খোঁজ কবেননি, তা কি হযেছে ওঁর—

সে একরকম মাথানিচু করেই জবাব দেয—খুব জ্বর হয়েছে কদিন, এখনো জ্বর ছাড়েনি ভালো করে—

উনি তোমার কে হন—

বাবা।

ও তুমি পরমেশ্বরবাবুরই ছেলে—

ভদ্রলোক তার সমস্ত শরীরটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

আচ্ছা তুমি একটু বসো। চটির চট চট শব্দ করতে করতে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। সে শুনতে পেলো তিনি দোতলা থেকে তিনতলায় উঠলেন, তারপর আরো উপরে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো চটির শব্দ।

যতোক্ষণ তাঁর পায়ের শব্দ কানে আসছিলো ততোক্ষণ খুব একা-একা লাগেনি। কিন্তু এবার তার ভীষণ একা মনে হতে লাগলো। একেবারে প্রায় অপরিচিত জায়গায় বসে থাকতে তার যে কি খারাপ লাগে তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না কাউকে। এতো বড়ো বাড়িটায় ওই ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউ তাকে চেনে না। আর যদি কেউ জানতে পারে সে কি জন্যে এসেছে, তা হলে? ভাবলেই তার লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসে। আর বাবাই বা কি! টাকাটা চেয়ে নিয়ে যেতে পারেনি সময় করে। এ-ভদ্রলোকই বা কি। টাকাটা বাড়ির চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে কি এমন ক্ষতি হতো। আর তা ছাড়া বাবারতো পাওনাই টাকাটা। কার দোষ বেশি সে হিসেব করতে পারে না।

এমনি সময় তারই বয়সী দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে বেশ সেজেগুজে তার সামনে দিয়ে চলে যায় বারান্দাটা দিয়ে। তারা খুব অবাক হয়ে তাকাতে তাকাতে যায় তার দিকে। খুব যেন অবাক হয় তারা। কোনোদিনো দেখেনি তাকে এর আগে। ভারি অস্বস্তি বোধ করে সে। বাবাকে নিশ্চয় তারা দেখেছে। একবার ভাবে তার পরিচয়টা জানিয়ে দেবে নাকি! না, সত্যি ভারি অসুবিধে লাগে। সবচেয়ে ছোট যে-ছেলেটি ওদের মধ্যে সে বার বার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে নেমে যায়। সে আড়চোখে তাকে দেখে।

এমনভাবে যে কতোক্ষণ কেটে যায় খেয়াল থাকেনা। ভদ্রলোক সেই যে বলে গেলেন, একটু বসো, তারপর তো অনেকক্ষণ কেটে গেলো। কই তিনি তো নিচে নামলেন না। তার মন খারাপ হয়ে যায়। ভয় হয় ভুলে গেলেন নাকি তিনি তার কথা।

মনে মনে ফের ভাবে এইবার বুঝি তাঁর চটির শব্দ শোনা যাবে আবার। সে শুনতে পাবে চট চট শব্দ করতে করতে তিনি চারতলা থেকে তিনতলায়, তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে আসছেন। তাঁর পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে বেশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। তারপর বারান্দা দিয়ে হেঁটে এসে ফের বসবেন তার সামনেব বেতের চেয়ারটায়। তারপর টাকাটা আস্তে তার হাতে দিয়ে বলবেন—

কিন্তু ওমা, কই। সে সব কিছুই নয়। কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কালো মতন রোগা একটি ছেলে। তার গলার স্বরে চমক ভাঙে। কোথায় চট চট শব্দ আর সেই ভদ্রলোক।

এই যে, সেই রোগা কালো ছেলেটি তার দিকে একখানা ঝক্‌ঝকে পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলে—ধরুন, বাবু দিলেন।

সে তার মুখের দিকে না-তাকিয়েই টাকাটা নেয়। তারপর আস্তে আস্তে নেমে চলে আসে সিঁড়ি বেযে।

রাস্তায় পা দিয়েই সে ফুলে ফুলে ওঠে ভেতরে ভেতরে। বুক ঠেলে তাব কান্না চাপে। খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির দিকে আসে। প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে এসে মা'র হাতে দিয়ে দেয় সে নোটখানা।

মা'র মুখ দেখে মনে হয়, মা যেন অনেক কিছু ভেবে বসেছিলো। টাকাটা হাতে দিতেই মা'র মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে আসে—এ কী রে।

সে মা'র কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না। সরে যায় শুধু সামনে থেকে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই।

কয়েকটা দিন কেটে যাবে পরপর। খুব অস্পষ্ট মনে থাকে তার এ-সব দিনগুলোর কথা।

বেশ বুঝতে পারে তাড়াতাড়ি কাটতে চায় না দিনগুলো।

সকাল থেকে কতোবারই না বাবাকে দেখে। বাবার জ্বর নামে, আবার হয়তো উঠলো একটু ; আবার নামবে। বাবার যেন কান পরিবর্তন নেই। অসুখে পড়বার আগে বাবার মুখে দাড়ি দেখেনি সে। তারপর কখন একটু একটু দাড়ি উঠেছে সারা গালে। তারপর সারা মুখ দাড়িতে ভরে.গেছে। কেমন কেমন দেখায় বাবাকে। সে টের পায় অনেকদিন হলো বাবা দাড়ি কামায়নি, অনেকদিন হয়ে গেলো বিছানায় শুয়ে আছে। এরপর সে ক্যালেণ্ডারের দিকে চায়। হিসেব করে দেখে কটা দিন গেলো বাবার বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

জ্বর তারপর একদিন সত্যি সত্যিই ছেড়ে যায়। হাঁফ ছেড়ে মা যেন বাঁচে। দাড়ি কামিয়ে বাবার মুখটা ভীষণ পাতলা দেখায়। খুব রোগা-রোগা আর সাদা দেখায় মুখখানা। যাক তবু অসুখতো সেরে গেছে। সেও যেন নিশ্বাস নিতে পারে ভালো করে কথাটা ভেবে।

এরপর মা ছোড়দিকে ধরে বসে একদিন।

আমি বলি কি পারু, তুই না-হয় যা না একদিন অরুদের ওখানে। আমার বলার চেয়ে তোর বলাটাই ভালো দেখায়—

মা'র কথার উত্তরে কি বলবে ভেবে পায়না ছোড়দি। অনেক সময় মা'র অনেক কথার উত্তরে ম্লান হেসেছে। ছোড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারে, মা'র মুখের দিকে চেয়ে খুব দুঃখ পায় ছোড়দি। অথচ সে লক্ষ্য করে দেখে মা বুঝতে পারে না ছোড়দির অসুবিধে কোথায়।

ছোড়দি যে কিছুতেই নিজে যেতে পারবে না অরুদিদের ওখানে টাকার জন্যে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে ছোড়দির অন্যমনস্ক ভাব

দেখে। তারপর বলাইবাবুদের সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়ে যায়, তা হলে তো আর রক্ষে নেই।

কিছুক্ষণ পরে ছোড়দি নিজেই কি ভেবে চিন্তে বলে—আচ্ছা মা, আমি বরং ঝুনকোদের ওখানেই একবার গিয়ে দেখি না কেন। তা-ই দেখি একবার—বলে বেরিয়ে যায়।

পানুদের কাছথেকে যে কি করে টাকা জোগাড় করবে তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ছোড়দির কি সত্যিই মাথা খারাপ হলো না কি? পানুদের ওখানে গিয়েও কি বুঝতে পারে না কিছু। পানুর দাদা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। পানু'ও বোধ হয় স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। শঙ্করবাবুদেব মোটরগাড়ি ধোয়ার কাজ নিয়েছে নিশ্চয়। ভারি জেদি ছেলে পানু। কিন্তু কতোটাকাই বা পাবে? লেখা পড়া শিখতে পারলে নিশ্চয় আরো অনেক বেশি টাকা পেতো সে। পানুর একটা কথা মনে এলে এখনো হাসি পায় তার। পানু বলে, ত্থাখ মা খালি বলবে মানুষ হ, মানুষ হ দিকি। লেখা পড়া শিখে সংসারেব দিকে একটু তাকা দিকি—কেমন একটা অঙ্গভঙ্গী করে দেখিয়েছিলো বেশ।

সে ভেবে দেখে মাও তো তাকে প্রায় এমনিভাবেই বলেছে কতোবার। ভেবেছে কতোবার লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চায়ের দোকানে কিংবা গাড়ি ধোযার কোনো কাজ নেবে। মা কি তাতে খুশি হবে না? নিশ্চয় হবে। কিন্তু কই লেখাপড়া ছাড়তে পারে না কিছুতেই।

যা ভেবেছিলো ঠিক তাই। ছোড়দি শুধু হাতেই ফিবে এসেছে। কিন্তু কেমন যেন হাসি খুশি ভাব ছোড়দির। কী ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারে না মুখ দেখে।

ছোড়দি হাসতে হাসতে বলে মাকে—জানো মা, ঝুমকোর বিয়ের সব ঠিক—

মার মুখ দেখে মনে হয় মা যেন বিশ্বাস করতে চায় না কথাটা। জিজ্ঞাসা করে, কোথায় রে ?

ওই শঙ্করবাবুদের ড্রাইভারের সঙ্গে।

সে কী রে ! ভদ্দরলোকের মেয়েটাকে শেষকালে ওর হাতে—

ও কথা বোলো না মা, লোকটাকে তুমি দেখোনি শোনোনি অমনি যা-তা—

ছোড়দির কথা আর শেষ হয় না। মা'র কথা শুনে সে রাগ না করে থাকতে পারে না। সে ছোড়দির পক্ষ নিয়ে বলে—তুমি জানো নিপুর মেজদার সঙ্গে পড়তো ? কিছু জানোনা, শুধু শুধু বলবে যা তা—

পরে একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলে, নিপু ওর কথা আমায় সব বলেছে।

মা এই তর্কের মধ্যে আর যায় না। আসল কথাটা ভোলে না। ছোড়দির দিকে ফিরে বলে, তুই না-যাস তো ভালো করে সব কিছু জানিয়ে লিখে দে অরুকে, ও-ই (অনিন্দ্যকে দেখিয়ে) যাক।

সে জানে ছোড়দি কিছুতেই অরুদিকে লিখবে না, লিখলে শ্বেতাদিকেই লিখবে।

॥ ৭ ॥

ছোড়দির চিঠি নিয়ে সে যখন বেরিয়েছে তখন দেখে বিকেল পড়ন্ত নয়। সারাটা আকাশের গায়ে রোদ ছড়ানো। বেশ বিষ্টি হয়ে গেছে এই কয়েকটা দিন আগেই। মন্দ লাগে না তাই রোদ্দুর মাখা আকাশটাকে। বেশ বুঝতে পারে এইবার রোদ্দুরের পালা চললো। সূর্যের দিকে পিছন ফিরে সে মাঝে মাঝে যখন আকাশের একটা কোণে তাকাবার চেষ্টা করে, তার মনে হয় মস্ত বড় সাদা ধবধবে একখানা কাপড় কে যেন কেচে মেলে দিয়েছে অনেক উঁচুতে শুকোবার জন্যে। বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে কাপড়খানা। ভাবতেও মজা লাগে তার। যা গরম তাতে বোধ হয় পুড়ে এক্ষুনি চিমসে হয়ে যাবে কাপড়খানা। হাসি পায় তার একটু পরেই। কোথায় কাপড় আর কোথায়-বা কি। গরম লাগছে তো তার মাথায় মুখে আর গালে। সে যখন বেশ ছোটো ছিলো, তখন সে জোর করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করতো। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটো ঝাপসা দেখতো সব কিছু। টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়তো চোখ থেকে। ছোড়দির চোখে যদি পড়ে যেতো ছুটে, ছোড়দি এসে আঁচলটা দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরতো। ধমক দিয়ে বলতো—চোখ দুটোকে কানা করবি নাকি।

সে সমস্ত মাথাটা গুঁজে দিতো ছোড়দির কোলের মধ্যে আঁচলে মুখ ঢেকে। খুব ঠাণ্ডা লাগতো চোখ দুটো তখন। মনে পড়ে কোথা থেকে সে একটা নীল কাঁচের চশমা পেয়েছিলো। পাড়ারই কেউ বোধ হয় দিয়েছিলো তাকে। সেটা চোখে দিয়ে

যখন সূর্যের দিকে চাইতো তখন দেখতো সূর্যের চারপাশটায় যেন মেঘ-মেঘ করেছে, সমস্ত আকাশ যেন হালকা মেঘে ছেয়ে গেছে। হয়তো বিষ্টিও পড়তে পারে। কিন্তু আজকাল তার একেবারে মেঘ ভালো লাগে না। কোথা থেকে যেন মন খারাপ হয়ে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে আকাশে মেঘ করে আছে, আর ছোট্ট অন্ধকার বাড়িটা আরো ছোট্ট দেখাচ্ছে তখন যে তার কান্না পায় একথা একটুও মিথ্যে নয়। বর্ষাবাদলার দিনে খালি তার একটা ভাবনা। কবে বিষ্টি ধরে যাবে কবে আবার সূর্যের মুখ দেখতে পাবে। জুতোটা যদি একবার ভিজে সপসপে হয়ে ওঠে তাহলে আর দেখতে হবে না। কবে যে শুকুবে তার কোনো ঠিকও নেই। আর ভিজে জুতোই-বা সে পায় দেয় কি-করে। খালি পায়ে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না তার।

বাস যখন তাকে অরুদিদের বাড়ির রাস্তাটার মোড়ে পৌঁছে দিলো তখন সে ভেবেছে দরজার মুখেই যদি বলাইবাবুর সঙ্গে তার চোখা চোখি হয়ে যায় আর বলাইবাবু যদি তাকে সোজাসুজি ভেতরে নিয়ে যান, বলেন—দেখো মা কে এসেছে।

বলাইবাবুর মার দিকে চোখ তুলেই কি সে আবার চোখ নামিয়ে নেবে। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করবে তার। কেন বলাইবাবুর মাকে দেখলে তার অমনটা হয়। অথচ বলাইবাবুর মা তো তাকে কতো আদর করেন।

আচ্ছা তারপর শ্বেতাদি? তার হাত থেকে শ্বেতাদি যখন চিঠিখানা নেবে তখন যদি হঠাৎ অরুদি এসে পড়ে সামনে। না কেউ আসবে না। শ্বেতাদি তার হাত থেকে চিঠিখানা নেবে। একবার

দুবার অনেকবার পড়বে। পড়ে কি বলবে? লুকিয়ে টাকা এনে দেবে? একেবারে তার পকেটের মধ্যে গুঁজে দেবে, কোথা থেকে টাকা এনে। আশ্চর্য। এতোটুকু লজ্জা করবে না তার। অঞ্জন যদি আড়চোখে দেখে ফেলে সব। বলে দেয় তাদের মাকে। কিন্তু না, কিছু বলবেন না শ্বেতাদির মা। তিনিও মাঝে মাঝে টাকা দিয়েছেন তার মাকে। কিন্তু শ্বেতাদির মতো কেউ নয় ও-বাড়ির। ছোড়দি হিসেব করে দেখেছে সেদিন এখনো শ্বেতাদি তার কাছ থেকে পুরো দুখানা দশটাকার নোট পাবে। সত্যি কে বলবে শ্বেতাদি অরুদির বোন।

সে যখন একেবারে প্রায় দরজার কাছাকাছি এসে গেছে, তখন মাথাটা একটু পিছন দিকে ফেরাতেই দেখে রাস্তার ওধার থেকে—অরুদিদের বাড়িতে কাজ করে যে-ছেলেটা, সে তারই দিকে প্রায় দৌড়ে আসছে। দূর থেকে মাথার ওপর হাত তুলে কি বলে প্রথমটা বুঝতে পারে না সে।

কাছে এসে বলে—আমি তো তোমাকে বাস থেকে নামতে দেখেই আসছি। বেরিয়ে যাচ্ছিলুম তালা লাগিয়ে—

এবার দরজার দিকে লক্ষ্য করে দেখে সত্যিইতো একটা তালা ঝুলছে সেখানে। তার চোখেই পড়েনি—কী আশ্চর্য।

দিদিমণিরা তো সব বাইরে চলে গেলো। বড়দিদিমণি তো আবার একটু গরম পড়লেই এখানে থাকতে পারবে না।

আচ্ছা একতলায় যাঁরা থাকতেন—

ও, বলাইবাবুদের কথা বলছো। উনি তো বদলি হয়ে চলে গেছেন কলকাতার বাইরে।

সে একটু দমে যায়। তবে বলাইবাবু আর তাঁর মা আর এখানে

থাকেন না। এই তো সেদিনো বললেন বলাইবাবুর মা, ওদের আরেকদিন নিয়ে এসো অরু।

কবে ফিরবে বলতে পারো ?

সব তো বড়দিদিমণির ইচ্ছে, কে জানে কবে ফিরবে। তবে দাদাবাবু আর মা বোধ হয় আগে চলে আসবে।

ও শ্বেতাদিও ফিরছে না তা হলে। শ্বেতাদি তো ছোড়দিকেও একবার বলে যেতে পারতো। কেন যে এবার কিছু না-বলে চলে গেলো শ্বেতাদি। তারপর যতো রাগ তার গিয়ে পড়লো মা'র ওপর।

শুধু শুধু তাকে কেন পাঠালো মা। এমনভাবে ফিরে যেতে কারো ভালো লাগে। বেশ আছে অরুদিরা, একটু গরম পড়লো তো চললো কলকাতার বাইরে। তার কপালের ঘামটা সে জামার তলাটা দিয়ে মুছে ফেলে। আরো তার রাগ হয় শ্বেতাদির ওপর। মা'ও কি জানবে না ছাই অরুদিরা এখানে আছে কি নেই। ছোড়দির কিছু দোষ নেই, মা-ই তো তাকে জোর করে চিঠি লেখালো। যদি টাকা না পেতো, শুধু দেখা হতো শ্বেতাদির সঙ্গে তাও মন্দ লাগতো না। তবে শ্বেতাদির সঙ্গে দেখা হলে টাকা নিশ্চয় পেতো, একথা সে জানে। কিংবা বলাইবাবুদের সঙ্গেও যদি দেখা হতো, তা হলেও এতো কষ্ট হতো না তার। দুঃখ হতো না এত বেশি, রাগ হতো না নিজের ওপর আর মা'র ওপর।

রাস্তার মোড়ে এসেই সে বাস পেয়ে গেলো। সামনের বাসটা ছেড়ে দিলো। পিছনের দোতলাবাসটার ওপরে উঠে গেলো। এ-বাসটায় ভিড় নেই মোটে। কাঁচের জানালার কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ে। বাসটা একটা বাঁক নিতেই কাঁচের জানালার মধ্যে

দিয়ে রোদ্দুর এসে লাগে তার মুখে মাথায়। কোলের ওপর এসে পড়ে রোদ্দুর। এ-রোদ্দুরে খারাপ লাগেনা তার। দোতলা বাসে, তার মনে পড়েনা, সে কোনোদিনো নিচে বসেছে। ভাবি ভালো লাগে তার ওপরের কাঁচের জানালাব মধ্যে দিয়ে রাস্তার লোক আর গাড়ি দেখতে। একেকটা ভীষণ লম্বা মানুষ ছাড়া আর সব লোক-গুলোকে দেখতে কেমন বেঁটে বেঁটে লাগে অথচ বাস থেকে নেমে রাস্তায় সে দেখেছে তাবা তার চেয়ে অনেক উঁচু। আর সামনের দিকে চোখ মেলে রাখলে দেখতে পায় রাস্তাটা অনেক দূব পর্যন্ত। কে যেন পিছন থেকে ভীষণ জোরে ঠেলে দিয়েছে বাসটাকে, আর বাসটা যেন গড়গড় করে গড়িয়ে চলেছে সামনেব দিকে। একটা লোক সামনে এসে পড়ে। তার মনে হয় লোকটা বুঝি এক্ষুনি পড়ে যাবে চাকার তলায়। কিন্তু আশ্চর্য লোকটা ঠিক বাসটার নাকেব সামনে দিয়ে দৌড়ে পার হয়ে যায় রাস্তাটা।

সে তো উত্তেজনায় একেবারে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এতোগুলো লোক নিয়ে এতো বড়ো বাসটা যে কি করে সাপের মতন এঁকে বেঁকে চলেছে এতো গাড়ি ঘোড়া আর মানুষেব পাশ কাটিযে একটুখানি জাযগার মধ্যে দিয়ে, তা ভাবলেও এক সময় তার বুক ঢিপ ঢিপ কবে। সব চেয়ে মজা লাগে যখন রাস্তার ধারে মস্ত একটা গাছের ছোট ছোট কয়েকটা ডালপালা জানালার কাঁচে এসে সরসর করে লাগে। হাসি আসে তার। মনে হয় বাসটার চেয়েও আরো উঁচু লম্বা একটা লোক বুঝি দুহাত দিযে বাসটাকে ধরতে চাইছে। আর এমনি সময় পুলিশ হাত দেখাতে সত্যিই থেমে যায় বাসটা।

তার মনটা এতোক্ষণে অনেক হালকা হয়ে আসে। মা'র

ওপর রাগ তার পড়ে গেছে। শ্বেতাদির ওপরও তার রাগ নেই। সে বাঁ-দিকের জানালাটা দিয়ে চেয়ে থাকে বাইরে। পরপর কি দেখতে পাবে সে মুখস্থ বলে যেতে পারে। সেই সাদাগির্জেটা প্রথমে চোখে পড়বে। যতোবার দেখে ওটাকে বাসের জানালা থেকে ততোবার তার নতুন লাগে। যতোক্ষণ দেখা যাবে ততক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখবে সে। তারপর আসবে কলকাতার তাজমহল। পান্নুর মুখ থেকে শুনেছিলো সে কথাটা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নাকি কলকাতার তাজমহল। পান্নু বলেছিলো ইতিহাসের বইতে দেখিসনি একটা বড় তাজমহলের ছবি আছে। সেটা আগ্রার তাজমহল। আর কলকাতারটা ছোট। কলকাতার এই তাজমহলের পরে আসবে অনেক দূর পর্যন্ত সবুজ সবুজ মাঠ।

এই মাঠের ওপর দিয়ে অনেক অনেকদিন আগে সে খালি পায়ে হেঁটেছিলো। পায়ের তলায় নরম ঘাসগুলো সুড়সুড়ি দিতে থাকে। বাবা কাছেই একটা বেঞ্চে বসেছিলো। সে বাবার কাছে জুতোটা খুলে রেখে দৌড়ে অনেকখানি চলে যায়, বাবাকে প্রায় দেখা যায় না এতো দূরে, তারপর আবার লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে। হঠাৎ তার কানে যায়—হ্যাপি বয়...হ্যাপি বয়। দেখে একটা লোক, মাথায় তার সাদা টুপি, একটা হলদে রংয়ের গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আসে। তাদের সামনে এসে লোকটা দাঁড়ায় একটু।

সে জিজ্ঞাসা করে বাবাকে—হ্যাপিবয় কি বাবা?

বাবা বলেছিলো, হ্যাপি বয় মানে সুখি ছেলে। ওই হলদে গাড়িটায় একটা জিনিস আছে, খুব ঠাণ্ডা আর মিষ্টি। যে-সব ছেলেরা সব সময় হাসিখুশি থাকে তারা শুধু ওই জিনিসটা খেতে পাবে, তার মতন দুষ্টু ছেলেরা নয়। আর সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে, হ্যাপিবয়—

সে বাবার কাছে আবদার করে তাকে একটা হ্যাপিবয় কিনে দেবার জন্যে। বাবা তাকে একটা হ্যাপিবয় কিনে দিয়েছিলো। পাতলা কাগজের ঢাকাটা সরাতেই দেখতে পেলো ধবধবে সাদা হ্যাপিবয়, একটা কাঠির ওপরে। জিভ দিয়ে একটু চাটতেই খুব ঠাণ্ডা লাগে জিভটা, তারপর গলার মধ্যে একটুখানি হ্যাপিবয় যেতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায় গলাটা। একটু কামড় বসাতেই বেশ খানিকটা নরম হ্যাপিবয় কাঠি থেকে খসে পড়ে যায় ঘাসের ওপর। ভারি আপসোস হয় তার। ঘাসের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে। যেই সে কুড়োতে যাবে মাটি থেকে, বাবা দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে ওঠে। এখনো ভাসা ভাসা মনে পড়ে তার হ্যাপিবয় খাওয়ার কথাটা।

মাঠের সবুজ রংয়ের তাঁবুগুলোর দিকে চোখ পড়বে এর পর। এ-পাশে ও-পাশে ছড়ানো তাবুগুলো। সবচেয়ে ভাল লাগে দূর থেকে দেখতে, ট্রাম বা বাসের ছোট জানালার মধ্যে দিয়ে। আঁকা-আঁকা মনে হয় তার ও-গুলোকে। যেন সবুজ রং দিয়ে আঁকা কুঁড়েঘর। ঠিক কুঁড়েঘর নয়, অনেকটা যেন কুঁড়েঘরেরই মতন। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে হালকা, কখনো বা ঘন সবুজ মাঠ। আর তারই মাঝখানে তফাতে তফাতে ওই সবুজ তাঁবুগুলো। বিষ্টির দিনে সব চেয়ে ভালো লাগবে। মাঠে একটিও লোক থাকে না, ঝপঝপ ঝপঝপ করে একটানা বিষ্টি পড়বে, ভেজা-ভেজা তাঁবুগুলোকে কেমন ঝাপসা-ঝাপসা দেখাবে মেঘলা আকাশটার নিচে। এ-সময় ঠিক তার মনে হবে কোথায় কোন বইতে যেন সে একটা ছবি দেখেছিলো। সে-ছবির বাড়িগুলো ঠিক এই বিষ্টিতেভেজা তাঁবুগুলোর মতন। বিষ্টি বাদলার দিনে কখনো ট্রামে করে এইখান দিয়ে যেতে

যেতে তার মনে হয়েছিলো, টুপ করে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে এই মাঠের মধ্যে দিয়ে ভিজতে ভিজতে সামনের ওই কোনো একটা তাঁবুকে ছুয়ে আবার বিষ্টির মধ্যে ছুট্টে চলে আসতে কতোক্ষণই বা লাগবে। তারপরই হাসি পেয়েছিলো তার নিজেকে কি বোকা ভেবে।

আর এর পরই এসে যাবে মনুমেণ্ট। ফাঁকা মাঠে নেড়া মস্ত লম্বা একটা তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে মনুমেণ্টটা। এখন মনুমেণ্টটা ভীষণ পুরোনো পুরোনো লাগে তার। কেমন যেন রং চটে গেছে। আর মনুমেণ্টের বাইরের সিঁড়িগুলোতে যে কতোকালের ধুলো জমে আছে তার ঠিক নেই। চারপাশটায় তো একটুখানিও সবুজ ঘাস দেখতে পাওয়া যাবে না। নোংরা ছেঁড়া কাগজ, চীনেবাদামের খোসা, আখের ছিবড়ে, লেমনেডের বোতলের ভাঙা কাঁচ আর ছেঁড়া দু এক পাটি ক্যাম্বিসের জুতো, আরো কতো কি যেন, চারিদিকে ছড়ানো। কোনোদিনো কি মনুমেণ্টটা ঝকঝকে নতুন ছিলো। তার তো মনে হয় না।

সব কিছু ছাড়িয়ে বাস প্রায় এতোক্ষণে মনুমেণ্টের কাছাকাছি এসে গেছে সত্যিই।

সে ভালো করে চোখ চেয়ে দেখে এবারে। লোকের ভীড় যেন বেশি এদিকটা আজকে। খেলার মাঠের ভিড় ভাঙলে সে দেখেছে এমন লোকে লোকে ভরে যায় মাঠটা। সে আবার ভালো করে চোখ মেলে। লোকগুলো তো কই এগোচ্ছে না সামনের দিকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আর কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে সামনের দিকে তাকিয়ে। এবার সব স্পষ্ট হয়ে আসে তার কাছে। সে দোতলা বাসটার জানালা থেকে দেখতে পায় মনুমেণ্টের চারিপাশটা।

অসংখ্য লোকের মাথা। লোকগুলো সব বসে পড়েছে মাটিতে। দুর থেকে চট করে বোঝা যায় না।

কাঠ দিয়ে দিয়ে উঁচু-করা জায়গাটার ওপর কয়েকটা চেয়ার পাতা। আর সেখানেও জনকয়েক লোকের ভিড়। সামনে মাইক্রোফোনের কাছে এসে একটা লোক যেন কি বলছে। কিছু শুনতে পায় না সে। বেশ বুঝতে পারে কোনো একটা বড় সভা হচ্ছে। সেই উঁচু মতন জায়গাটার পিছনে টাঙানো মস্ত লাল টকটকে একখানা কাপড়। সাদা সাদা অক্ষরে কি সব লেখা কাপড়টার গায়ে। পড়তে পারে না দূর থেকে। আশ্চর্য লাগে মনুমেণ্টের দিকে তাকিয়ে। কে বলবে মনুমেণ্টটা অমন পুরোনো, আর তার চারপাশটা অমন ফাঁকা-ফাঁকা। বার বার অদ্ভুত লাগে মনুমেণ্টটাকে।

বাসটা এবার জোরে বাঁ-দিকে মোড় নিতেই খেয়াল হয়। সব গাড়িগুলোকেই ঘুরিয়ে দিচ্ছে পুলিস হাত দেখিয়ে বাঁ-দিকে। সে জানে গাড়িগুলোর সব সোজা যাবার কথা। পুলিসে পুলিসে গিজ গিজ করছে জায়গাটা। এখন তার চোখের সামনে যদি ভেসে আসে স্কুলের গেটের মুখে দেখা সেই ছোট্ট ভিড়টা তবে হাসি পাবারই কথা।

এতোক্ষণ তো সে বেশ মুগ্ধ হয়ে দেখছিলো সব কিছু, খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এবার আনন্দে বাস থেকে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো রাস্তার ওপর। সে পরিষ্কার দেখলো ছোড়দিকে।

ছোড়দি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার শুকনো চুলের বেণীটা পিঠের ওপর থেকে থেকে নড়ছে। আঁচলটা নড়ছে

বাতাসে অম্ল। বেশ লাগছে দেখতে ছোড়দিকে। নিশ্চয় নিপুর মেজদার সঙ্গে এসেছে। মাকে কি বলে এসেছে ছোড়দি, সে কোথায় যাচ্ছে? নিশ্চয় না। কিন্তু যে-লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ছোড়দি সে লোকটা কে? তাকে তো কই কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ে না তার। নিপুর মেজদা তবে কাছাকাছি কোথাও আছে। লোকটা নিপুর মেজদারই জানাশুনো কেউ হবে। তার একবার গলা ছেড়ে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে ছোড়দি বলে। ছোড়দির ওপর থেকে চোখ তুলতে পারে না সে। ভয় হয়, একটু ওদিকে চোখ সরালেই বুঝি হারিয়ে যাবে। সে ছোড়দির ওপর চোখ রাখতে রাখতেই উঠে দাঁড়ায় নিজের জায়গা ছেড়ে।

এমনি সময় কন্‌ডাক্‌টার এসে তার কাছে টিকিট চায়। পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে সে একটা সিকি বার করে দিয়ে দেয় তার হাতে। তাড়াতাড়ি নেমে আসে সিঁড়িটা বেয়ে।

এই যে পয়সাটা নিয়ে যাও, এই যে—

তার কানে পরিষ্কার যায় কথাগুলো। তবু কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে নেমে পড়ে বাসটা থেকে। কথাগুলো যে কন্‌ডাক্‌টার তাকেই বলছে, সে যেন বুঝেও বুঝতে পারলো না। খেয়ালই থাকে না একদম।

মাথায় ঘুরছে কেমন করে ছোড়দিকে পিছন থেকে ডেকে অবাক করে দেবে। ওই ভিড়ের মাঝখানে নজরই থাকবে না ছোড়দির তার ওপর। সে পিছন থেকে আস্তে আস্তে গিয়ে চোখ টিপে ধরবে। ছোড়দি কাদের নাম করবে পরপর। মিলবে না। তারপর যেই সে হাত সরিয়ে নেবে পিছন ফিরে অবাক হয়ে

যাবে। আশ্চর্য! ভাবতেই পারবে না এখানে এসে তাকে খুঁজে বার করবে।

নিজেই বোকা বনে যায় শেষ পর্যন্ত। এতো বেশি অবাক সে এর আগে আর কখনো হয়নি।

ছোড়দির সঙ্গে যে-কোনো মেয়ের চেহারার এমন হুবহু মিল থাকতে পারে আগে তা জানা ছিলো না। ভাগ্যি পিছন থেকে চোখ টিপে ধরবার আগেই মেয়েটি একবার মুখ ফিরিয়েছিলো। কি হতো তা না হলে! ভাবলেও তার বুক ঢিপ ঢিপ করে। কি মনে করতো মেয়েটি। পাশের লোকটি নিশ্চয় তাকে যা তা বলতো।

সে তো প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলো। মেয়েটিও যে কম অবাক হয়নি তার চোখের দিকে তাকিয়ে সে-কথা সে বুঝতে পারে। তারপর তার অবাক-অবাক ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে যখন, কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে, তাদের পাশ দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে তার কানে স্পষ্ট যায় কথাগুলো। মেয়েটি লোকটিকে বলছে, আমি তো মেজোমাসির ছোট ছেলে মনে করেছিলুম, তাই— মেয়েটির কথা আর শেষ হয় না।

আরে, আমিও তো—কি বলতে যায় লোকটি। শুনতে পায় না আর একটি কথাও।

মাইক্রোফোন থেকে কার গলার জোর আওয়াজ ভেসে আসে কানে। খুব স্পষ্ট আওয়াজ: এবার উত্তর দিক থেকে একটি দল আসছে, তাঁরা এদিকেই আসছেন, আপনারা তাঁদের সম্বর্ধনা জানান, আপনারা সবাই মিলে তাঁদের সম্বর্ধনা জানান, তাঁরা এগিয়ে আসছেন, মিছিলটিকে আপনারা সম্বর্ধনা জানান......

তার সমস্ত মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখে, সত্যি সাপের মতো এঁকে বেঁকে আসছে অনেক অনেক মানুষের মাথা। সে ডিঙি মেরে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে সামনের লোকগুলোর মাথা আর কাঁধের ওপর দিয়ে।

রোদ প্রায় পড়ে এসেছে। পশ্চিম দিকটার খানিকটা শুধু লাল হয়ে আছে; সূর্যের চারপাশটা। সূর্যের গায়ে হাত দিলেই মনে হয় ফোসকা পড়ে যাবে, কিন্তু তাকিয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগে আকাশটার দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে নেশা ধরে যায় চোখ দুটোয়। কবে যেন এ-রকম আকাশ সে দেখেছিলো।

এবারে তাকিয়ে দেখে মিছিলটা এগিয়ে এসেছে আরো অনেকখানি। মিছিলের মাথাটা মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে চলে এসেছে খানিকটা। লাল সালুর কাপড়ের ওপর লেখা রুপোলী অক্ষরগুলোর ওপর এসে পড়েছে পশ্চিম আকাশের শেষ আলোটুকু। বেশ সাদা আর চকচকে দেখায় অক্ষরগুলো। মিছিলটা আরো খানিকটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের সব লোকগুলো আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে। খেলার মাঠে গোল হলে যেমন চীৎকার হয়, অনেকটা সে-রকমের, মনে হয়। বাতাসে শব্দের রেশটুকু কিছুক্ষণ কেঁপে কেঁপে তারপর মিলিয়ে যাবে কোথায়।

আবার মাইক্রোফোন থেকে জোর আওয়াজ আসে কার গলার: আপনারা যারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা বসে পড়ুন, নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ুন, আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না; বসে পড়ুন, দয়া করে বসে—

তাকিয়ে দেখে চারপাশে তার সামনে পিছনে অনেকেই যারা দাঁড়িয়ে ছিলো তারা সবাই বসে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে

আসার চেষ্টা করে। যদি বসে পড়ে তো আর চট করে বেরুতে পারবে না। বেরুতে গেলে এর ওর ঘাড়ের ওপর পা-ফেলে বেরুতে হবে। আর তাছাড়া বসে থাকার চেয়ে চারপাশটা গোল হয়ে ঘুরে দেখতে তার বেশি ভালো লাগছে। এর-ওর পাশ কাটিয়ে যখন বাইরে .আসার চেষ্টা করে তখন তার হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে যায় ছোট মতো একটি মেয়ে। কাগজখানার দিকে একবার চোখ বুলিয়েই সে ভালো করে তাকায় মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি তাকে চিনতে পারে না। সে চিনতে পেরেছে মেয়েটিকে। সেই মেয়েটি, যে সেদিন দুপুরে তাদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদা তুলছিলো টিনের বাক্সটা হাতে করে। আজ সে কিসের কাগজ বিলি করছে। একখানা শাড়ি পড়ে আছে আজ। তাই বড় বড় মনে হচ্ছিলো তাকে। মাথার চুলগুলো সব পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। রংটা তার ফরসা নয় মোটেই, রোদ্দুরে পুড়ে একটু বেশি কালোই দেখাচ্ছে। কিন্তু তাকে দেখতে বেশ লাগছে। একবার ভাবে জিজ্ঞাসা করে তার নাম কি, কোন স্কুলে পড়ে, কোথায় তাদের বাড়ি, আর বাবা স্কুলে পড়ান কিনা। আশ্চর্য। চিনতে পারলো না তাকে। সেদিন তো কতোক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিলো সে। তারপরই ভাবে কে তাকে এমন করে চাঁদা তুলতে শেখালো, কাগজ বিলি করতে শেখালো। আচ্ছা, দেরি করে বাড়ি ফিরলে তার মা তাকে কিছু বলবেন না, তার বাবা? তার ক্ষিদে পায়নি? মুখখানা তো শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া খুবই তো রোগা মেয়েটি। ভারি মায়া হয় তার।

মেয়েটির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কিছুতে। সে হাতের কাগজগুলো

বিলি করতে করতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত। তবু ভাবে একবার সে খুশি হতো, খুব খুশি হতো যদি মেয়েটি চিনতে পারতো তাকে।

সূর্য অস্ত গেছে এতোক্ষণে। আবছা আবছা অন্ধকার আকাশ টাকে ঘিরে ফেলেছে। আর চারপাশের অস্পষ্ট আলোয় ভিড়টাকে আরো বেশি মনে হয়। খেয়াল করতে পারে না লোক এর মধ্যে আরো বেড়ে গেছে কিনা। তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। তবু বাড়ি ফিরতেই হবে। ক্ষিদের চোটে পেট চনচন করছে, মাথাটা ঘুরছে অল্প অল্প। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করে সে। কখন বেরিয়েছে বাড়ি থেকে কিচ্ছুটি মুখে না-দিয়ে। দুপয়সার মুড়ি কিনে খেলে মন্দ হয় না। অনেকেই মুড়ি কিনে খাচ্ছে। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখে একটিও পয়সা নেই। তার মনে পড়ে বাসের সব কথা। সিকিটা তো সে কন্ডাক্টারের হাতেই দিয়েছিলো। তবে? হ্যাঁ, মনে পড়ে যেন তার, তাকে তো পয়সা ফেরত নেবার জন্যে ডেকেছিলো লোকটা। কিন্তু সে কি শুনতে পায়নি?. সে যদি পিছন ফিরতো তো শুনতে পেতো তাকেই ডাকছে কন্ডাক্টার—তার মনে হয় সে শুনতে পেয়েছিলো সব কথাগুলো। কেন সে তাড়াহুড়ো করে নেমে গেলো তবু। খালি মনে হয়েছিলো নিশ্চয় লোকটা অন্য কাউকে বলছে।

আপসোসে তার এবারে চোখে জল এসে যায়। কি করবে ভেবে পায় না। মুড়ি না-হয় না খেলো। ক্ষিদে সে চেপে রাখতে পারে। কিন্তু এতোটা পথ সে কি করে হেঁটে যাবে। বুক ঠেলে কান্না আসে ফের। এতো বড় মাঠটায় একটি লোকও কি তার জানা নেই, যার কাছ থেকে সে তিনপয়সা ট্রামভাড়া চেয়ে

নেবে ? অন্ধকারে ভিড়ে লোকগুলোর মুখ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারো মুখ ভালো করে দেখা যায় না। বেশ অন্ধকার নামছে আস্তে আস্তে। ক'টা বাজে খেয়াল করতে পারে না। না, একটি লোকও তার চেনা নয়। আর দেরি করলে চলবে না। তাকে এবার বাড়ির পথ ধরতে হবে। মাকে গিয়ে খবরটা দিতে হবে। মা যে খবরটা পেয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

যে-দিকটা থেকে মাইক্রোফোনের আওয়াজ আসছিলো সেদিকে চেয়ে দেখে উঁচুজায়গাটা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার দেখা যায় ওখানকার লোকগুলোকে। আর সমস্ত মাঠটা ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। মাঠে যে অতোগুলো লোক বসে আছে কারো সাধ্য নেই বুঝতে পারে। মনুমেণ্টের গায়ে এসে লেগেছে খানিকটা আলো কোথা থেকে ছিটকে। কালো কালো বড় ছায়া পড়ে মনুমেণ্টের গায়ে। অদ্ভুত লাগে দেখতে। কে বলবে অমন রংচটা আর নোংরা ওটা। আর মনুমেণ্টের ঠিক মাথার ওপরই দপ্ দপ্ করে জ্বলছে একটা তারা। ওদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারে না। সারাটা রাত ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একটুও ঘুম নামবে না তার চোখের পাতায়। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে সবকিছু ওই জোর আলোটার দিকে তাকিয়ে।

অনেক কথা ভাবতে ভাবতে সে বেরিয়ে এসেছে ভিড় ঠেলে এক সময় বাইরে। সারাটা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে যাবে এখন। যে জন্যে বেরিয়েছিলো বাড়ি থেকে, তার একটি কথাও মনে থাকে না। তাই তার রাগও থাকে না কারো ওপর। শুধু মনে হয় যদি বলাইবাবুর মা'র সঙ্গে দেখা হতো একবার। যদি তিনি জিজ্ঞাসা

করতেন : কেমন আছো সব, পারুল কেমন ? মা ?...বস, বলাই এখুনি ফিরলো বলে...তোমরা কই আরেকদিন এলে না ? কবে আসবে বলো ?

মাকে এ-খবরটা দিলে মা খুব খুশি হতো। কিন্তু, না, কোথায় কি। সে পাগলের মতো কার সঙ্গে কথা বলছে।

তার বার বার ইচ্ছে করে শুধু ফিরে যায় ওই জায়গাটায় যেখানে এখনো অনেক অনেক লোক বসে আছে দাঁড়িয়ে আছে, কতোক্ষণ কতো রাত থাকবে কে জানে, হয়তো সারারাত।

পথ চলতে চলতে বার বার তার কানে বাজে সেই লোকটার গলার স্বর, মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে এসে যে বলছিলো, উত্তর দিক থেকে একটি দল আসছে...মিছিলটি আপনাদের দিকেই এগিয়ে আসছে, আপনারা তাঁদের সম্বর্ধনা জানান।

হাজার হাজার লোকের চীৎকারে আকাশটা ফেটে গিয়েছিলো। সে বোধহয় চুপ করেই ছিলো, কিন্তু ওই ভীষণ আওয়াজে তার মনে হয়েছিলো সেও বুঝি চীৎকার করে উঠেছে। সে যে চুপ করে ছিলো এ-কথা তার এখন কিন্তু একটুও মনে পড়ে না। শুধু ফের মনে হয় তার গলার স্বর ওই লোকগুলোর চীৎকারের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো।

থেকে থেকে তার মনে পড়বে ওই মিছিলের কথা। মিছিল... মিছিল...মিছিল, তিনবার আওড়ায় সে কথাটা। কথাটার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ আছে কোথায়। সারা শরীরটায় কাঁপন লাগায় কথাটা, উত্তেজনায় থর থর কাঁপাবে সমস্ত দেহটাকে ওই একটা কথা।

আরে ! কোথায় যেন সে পড়েছে কথাগুলো, খুব পড়া-পড়া মনে হয়। খুব চেনা-চেনা। তবু মনে আসে না কেন কিছুতেই,

কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। হ্যাঁ এইবার তার মনে এসেছে। নিপুর মেজদা যে-বইখানা দিয়েছিলো ছোড়দিকে তার জন্ম দিনে, সেই বইটা। সেই তো সেই বইখানা, যেখানা বাবা অনেক রাত জেগে জেগে পড়েছিলো, অথচ তাকে পড়তে দেয়নি বাবা। সে বাবাকে লুকিয়ে পড়েছিলো কিছুটা। এখনো শেষ হয়নি সবটা। ওটার মধ্যেই তো সে পড়েছিলো—কথাটার মধ্যে যেন কোথায় বিদ্যুৎ আছে, সারা শরীরটায় কাঁপন লাগায় কথাটা, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপাবে সমস্ত দেহটাকে ওই একটা কথা।

আরো মনে আসে তার আর একটু ভাবলেই, মিছিল...মিছিল কি শুধু একটি ক্ষুদ্র মানুষের একটি ক্ষুদ্র লক্ষ্য ? তা কেন তা কেন, মিছিল তো হাজার হাজার লক্ষ মানুষের মহৎ বৃহৎ এক লক্ষ্য...

মনে পড়ে যায় বাবা মোটা মোটা করে দাগ দিয়ে রেখেছে কথাগুলোর নিচে। বাবার ভালো লেগেছে তবে কথাগুলো ?

পায়ের জুতোটা রাস্তার ওপর ঘষতে ঘষতে সে এবার বাড়ির কাছে এসে গেছে। খুব বেশি হেঁটেছে সে, কতোখানি পথ হেঁটেছে ? না খুব বেশি তো নয়, কিন্তু তবু তার জিভ শুকিয়ে গেছে, গলাটা একটু ভিজিয়ে না-নিলে মরে যাবে বুঝি এক্ষুনি, মনে হয় পা দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু, কিন্তু মাকে গিয়ে কি বলবে এখন সে। মা নিশ্চয় মস্ত কিছু ভেবে বসে আছে। সে কি তবে মাকে মিথ্যে কথা বলবে বানিয়ে বানিয়ে, তার সঙ্গে বলাইবাবুর মা'র দেখা হয়েছে, তিনি শীগ্গি আরেক দিন যেতে বলেছেন ছোড়দিকে নিয়ে, এই সব। মা কি খুশি হবে না ? আজকের দিনটাও তো খুশি

হবে। তারপর যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না। মা তো রাগ করবেই, ছোড়দিও বেচারি কম দুঃখ পাবে না।

আর সত্যি কথাটা বললেও তো মা আরো ভীষণ দুঃখ পাবে। ছোড়দি ছুটে আসবে সব কথা শোনবার জন্যে। বাবা শুধু পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে। জিজ্ঞাসা করবে না কোনো কিছু।

সে যে-ভয় করেছিলো তার একটুও রইলো না। বাড়ি ফিরে সে বাবা মা কাউকে দেখতে পায় না। শুধু চোখে পড়লো ছোড়দিকে। ঘরের মধ্যে কেরোসিনতেলের গন্ধ ভক্ ভক্ করছে। ছোড়দি হ্যারিকেনটাকে কানের কাছে তুলে ধরে দেখে তেল আছে কিনা সেটাতে। ছোড়দির হাতের ঝাঁকুনিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে সলতেটা। আর তাইতেই দেয়ালের গায়ে ছোড়দির মস্ত ছায়াটা কাঁপতে থাকে অদ্ভুতভাবে।

তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ছোড়দি হ্যারিকেনটা মাটিতে নামিয়ে রেখেই জিজ্ঞাসা করে—কি বললো রে ওরা, শ্বেতা চিঠিটা পড়েছে?

সে এ-কথার কোন উত্তর না-দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, মা কোথায় আগে বল।

মা তো ঝুমকোদের ওখানে। পানু কিছুক্ষণ আগে এসে নিয়ে গেলো মাকে। কাল ঝুমকোর বিয়ে, জানিস না?

তার মনেই ছিলো না কথাটা। তাইতো, শঙ্করবাবুদের ড্রাইভারের সঙ্গেই তো বিয়ে পানুর দিদির। শঙ্করবাবুকে বলে পানুকে সে নিশ্চয় ভালো একটা কাজ করে দেবে। সে ভাবে, যদি সে এসে ছোড়দিকে খবর দিত, বলাইবাবুর মা বার বার বলেছেন ছোড়দিকে নিয়ে তাঁদের বাড়ি যেতে। বলে দেবে নাকি সে ছোড়দিকে

সব কথা। বলাইবাবুরা আর ওখানে নেই, অন্য কোথায় উঠে গেছেন। না, থাক দরকার নেই।

বাবা কোথায় রে ছোড়দি ?

বাবা তো বাইরে চলে গেলো। সাতদিন বাদে ফিরবে মাকে বলে গেছে।

সে বিশ্বাস করে না কথাটা। কে বললো বাবা বাইরে গেছে। হয় ছোড়দি সব জানে, কিছু বলছে না তাকে, নয়তো বাবাই মা'র কাছে মিথ্যে কথা বলে গেছে। বাবার একটা কথাও সে বিশ্বাস করে না। এখুনি সে খুঁজে বার করে দিতে পারে বাবাকে।

তার মনে আছে সে যখন ছোট ছিলো তখন একটা লোক প্রায়ই তার বাবার কাছে আসতো টাকা চাইতে। লোকটা না কি টাকা পেতো তার বাবার কাছে। বাবা বেশির ভাগ দিনই দেখা করতো না লোকটার সঙ্গে। তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো, জিজ্ঞাসা করলে কিছুতেই বলিসনি যেন বাবা বাড়ি আছে।

সে মাথা নেড়েছিলো।

তারপর তাকে দরজার সামনে দেখতে পেলেই লোকটা জিজ্ঞাসা করতো, কি খোকা, বাবা বাড়ি আছে ? আর সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নেড়ে জানাতো, না।

তার মনে আছে, একদিন লোকটা ভীষণ রেগে গিয়েছিলো। চেঁচামেচি করেছিলো অনেকক্ষণ দরজাটার সামনে। লজ্জায় ভয়ে তার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। ভীষণ রাগ হয়েছিলো বাবার ওপর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো বাবার মিথ্যে কথা আর শুনবে না। আর কোনোদিনো বলবে না যে বাবা বাড়ি নেই। বলে দেবে সত্যি কথা। কিন্তু পারেনি সত্যি কথা বলতে শেষ পর্যন্ত।

মার কথা ভেবে শুধু কষ্ট হয় তার। মাকে কেন বাবা শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলে যায়। মা মিছিমিছি ভাববে। মাকে বলতে শুনেছে আমার কি শরীরে ছাই রোগও নেই, সবাই বিছানায় পড়ে, আমি তো পড়িনা।

মা'র কথা ভেবে সেও কি কম আশ্চর্য হয়।

মা যে একবার সেই রাগ করে ছোড়দিকে বলেছিলো না, আমার জন্যে কবে তোদের একশিশি ওষুধ লেগেছে বলতো, তোরা বলে তাই মুখ নাড়িস—মিথ্যে বলেনি মা একটুও।

ছোড়দি বেচারি একমাসে তিনবার জ্বরে পড়েছিলো সেবার। বছরটা ঠিক মনে নেই তার। মনে আছে, কি অসুবিধেটাই না ভোগ করেছিলো মা। ছোড়দি কিন্তু জ্বরের মধ্যেও রাগ করেনি মা'র ওই কথাগুলো শুনে। অবিশ্যি কথাগুলো বলেই মা আদর করে ছোড়দির রুক্ষচুলেভরা মাথাটা একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলো। চোখে জল এসে গিয়েছিলো মা'র।

একলা ভেবে দেখে যখন মা'র কথাগুলো, সে দেখে এতোটুকু মিথ্যে বলেনি মা। তার তো মনেই পড়ে না মা'র কবে সেই একবার অসুখ করেছিলো তারা এই বাড়িটায় আসার কয়েকটা বছর পর।

অথচ মা'র মতো খাটুনি বোধ হয় কেউ খাটে না। সকালে ঘুমভাঙ্গার আগে দেখে মা উঠেছে, আর রাত্তিরে সবাই যখন শোবার যোগাড় করছে তখনো মা'র খাওয়া হয়নি। এই বাড়িটার মধ্যে সকালসন্ধ্যে মা'র এটা ওটা করতে করতে কেটে যাবে। এ-বাড়ির বাইরে কতোকাল পা দেয়নি মা-ই সে-কথা ভালো জানে। শুধু দেখেছে এর জন্যে মা'র কোনো দুঃখ নেই। মা বেশ আছে।

কাপড়খানাও কি বদলাবার ফুরসৎ পায় না মা, না মা'র ইচ্ছে করে না ? না কি মা'র অভ্যেসই হয়ে গেছে এমন ময়লা কাপড় পরেথাকা। এর মধ্যে কোনটা সত্যি ঠিক করতে পারে না।

তার বিশ্বাস বাবার জন্যে মা'র অনেক কষ্ট। বাবা মা'র কাছে মিথ্যে কথা বলে কেন। কেন বাবা বলে গেছে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না বাবা কলকাতায় নেই। বাবা যা খুশি করুক, বাবা যতো খুশি মিথ্যে কথা বলুক, তার যতো কষ্ট শুধু মার জন্যে।

মা ঠিক বিশ্বাস করে বসে থাকবে বাবা এখানে নেই।

নজর পড়লো তার ঘরের মেঝের ওপর। পায়ের ছাপে ভরে গেছে ঘরখানা। ধুলোমাখা দুটো পায়ের দিকে এবার তাকায় সে। পা না-ধুয়েই ঘরে ঢুকে পড়েছে। খেয়ালই ছিলো না মাঠের যতো ধুলো পায়ে লেগে আছে। অন্যদিন হলে আর রক্ষে ছিলো না। মা ঠিক চেঁচিয়ে উঠতো—বেরো বেরো ঘর থেকে, আগে বাইরে থেকে পা ধুয়ে আয়। একখানা ঘরে লোকে বসবে শোবে—

কি ভাগ্যি মা নেই আজ !

বাইরে কার গলা শুনে ছোড়দি ঘর থেকে চলে যায়। মনে হয় নিপুর মেজদার গলা।

এতোক্ষণে বুঝতে পারে কেন এতো বেশি গরম লাগছে তার ঘরটার ভেতর। সে যে কখন জানালাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেছে তারপর আর কারো খোলবার অবসর হয়নি। মা তো ঝুমকোদিদের বাড়ি, ছোড়দিরও চোখ পড়েনি ও-দিকটায় ?

সে তাড়াতাড়ি জানালাটা খুলে দেবার জন্যে পা বাড়ায়। আলোটা

অনেক দুরে, প্রায় দরজার কাছাকাছি। এ-পাশের অস্পষ্ট আলোয় গোড়ায় বুঝতে পারে না। জানালার ছিটকিনিটা সরাতে গিয়েই তার চোখে পড়ে দুটো জানালার একটুখানি ফাঁকের মধ্যে কি একখানা খামের মতো। হাত দিয়ে একটু টান দিতেই বুঝতে পারলো খামের চিঠি একখানা। জানালাটা খোলবার কথা আর মনে থাকে না।

মেঝেতে উবু হয়ে বসে পড়ে একবার চোখ বুলোয় খামখানার ওপর। হাতের লেখা দেখেই ধরতে পারে অরুদির। মাকে লিখেছে। শ্বেতাদির চিঠি যে নয় তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। শ্বেতাদির হাতের লেখা বড় বড, আর লিখলে সে ছোড়দিকেই লিখতো।

ছোড়দির পায়ের শব্দ পেয়েই দুহাত বুকের মধ্যে পুরে সে চিঠিখানা আড়াল করে ছোড়দির চোখ থেকে।

মেঝের ওপর দিয়ে আঁচলটা টানতে টানতে ছোড়দি ঘরে ঢোকে, বলে—ঝুমকোর ভাই এসেছে। ঝুমকো নাকি ডাকছে। মা'র সঙ্গেই ফিরবো, বুঝালি ?

চলে যেতে যেতে আবার ফিরে দাঁড়ালো ছোড়দি। বললো দ্যাখতো খুব ময়লা দেখাচ্ছে কাপড়খানা ? এই তো একটুখানি যাবো। সত্যি শ্বেতা তোকে চিঠি দেয়নি, কি বললো সব বললি না তো—

বেশ খুশি দেখায় ছোড়দিকে। হাসি পায় যেন অনেক দূরে গেলে কতো ভালো কাপড়ই ছিলো ছোড়দির। আর কি বলেছে শ্বেতাদিদের লোকটা ছোড়দি শুনতে চায়।

এবারে খামখানা ছিড়ে চিঠিখানা বার করে সে মেলে ধরে

হ্যারিকেনের সামনে। ঠিক যা ভেবেছে তাই। অরুদি লিখেছে মাকে—

মাসীমা

তোমাকে না-জানিয়েই পালিয়ে এসেছি বলে রাগ কোরো না। শ্বেতা বেচারির কিছু দোষ নেই। ওর এমন চট করে আসার ইচ্ছে ছিলো না। ওকে আমরাই জোর করে টেনে এনেছি।

যাক দরকারি কথাটাই তোমাকে বলি। বলাইদাদের খবর নিশ্চয় রাখো না। উনি হঠাৎ বদলি হয়ে ওঁর মাকে নিয়ে অনেক দুর চলে গেলেন।

বলাইদার মা'র পারুলকে বিশেষ পছন্দ হয়েছিলো বলে তো মনে হয় না। আর বলাইদার তো মা'র ইচ্ছেয় সব। আমি তোমার কাছে লুকোবো না কিছু।

বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় আসি। আমাদের জানাশুনো একটি ছেলে পাওয়া গেছে। লেখাপড়া যদিও শেখেনি, তবু বেশ ভালো ছেলেটি। আর তা-ছাড়া পারুলের সঙ্গে মানাবেও ভালো। ছেলেটি পিওনের কাজ করছে—

আর পড়তে পারে না। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তুমড়ে সে খামশুদ্ধ চিঠিখানা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে জানালার বাইরে ফেলে দিতে যায়। চিঠিটা বন্ধ জানালায় ঠোকা খেয়ে লাফিয়ে ফিরে আসে তার কাছে।

অরুদিদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর থেকেই তার মনটা ভারি ভারি ছিলো। কিন্তু বাস থেকে মাঠে নেমে-পড়ার পরই মনটা

অনেকখানি হালকা হয়ে গিয়েছিলো। সত্যি কথা কি মাঠ থেকে ফিরতেই মন চাইছিলো না।

বাড়ি ফিরে বাবার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে তার মনে হয়েছিলো একবার, সে নিজেও বেরিয়ে চলে যায় বাড়ি থেকে।

কিন্তু এখন? এখন মনে হচ্ছে গলার নালিটা যেন বুজে আসছে, ঢোঁক গিলতে পারবে না। কি কষ্ট হচ্ছে সে বোঝাতে পারবে না কাউকে। ছোড়দিও নেই, এক গ্লাস জল এনে দেবে তাকে। সে কি এক্ষুনি মরে যাবে এ-ঘরটার মধ্যে। জানালা দরজা ভেঙে মা আর ছোড়দি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখবে সে মরে পড়ে আছে।

জানালাটা খুলে অনেক দূরে সে ফেলে দেয় হাত বাড়িয়ে পাকানো খামটা। গায়ের জামাটা খুলে শুয়ে পড়ে খালি মেঝের ওপর। গরম লাগে পিঠের তলায় মেঝেটা। ধুলো কির কির করছে মেঝেটার ওপর স্পষ্ট অনুভব করে। ডানহাতটা ভাঁজ করে সে মাথার নিচে রেখেছে, আর বাঁ-হাতটা আলতো করে ফেলা কপালের ওপর।

মাথায় ঘুরছে শুধু ওই একটা কথা। বলাইবাবুর মা'র পছন্দ হয়নি ছোড়দিকে। কিন্তু সেদিন যে স্পষ্ট বললেন বলাইবাবুর মা—ওদের শীগ্রি আরেকদিন নিয়ে এসো অরু......ভালো করে কথা বলাই হলো না। বার বার তাকিয়ে দেখেছিলেন তিনি ছোড়দিকে। কতো আদর করেছিলেন। সেই বলাইবাবুর মা......না, না সমস্ত মিথ্যে কথা অরুদির। বলাইবাবু আর তাঁর মা যদিবা অনেক দূরে চলে গিয়ে থাকেন, বলাইবাবুর মা'র ছোড়দিকে ভালো লাগেনি এ-কথা একটুও সত্যি না। কেমন করে হবে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না সে কথাটা। কেন অরুদি ছোড়দিকে ভালোবাসে না একটুও। শ্বেতাদি তো অমন নয়। শ্বেতাদি

বোধ হয় অরুদিকে যতো ভালোবাসে তার চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে ছোড়দিকে। সেই জন্যে কি ছোড়দির ওপর অতো রাগ অরুদির।

আচ্ছা, অরুদির চিঠির বদলে শ্বেতাদির চিঠি আসতে পারতো না আজ? শ্বেতাদি যদি লিখতো—বলাইবাবু ফের বদলি হয়ে তাঁর মাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। তাঁরা কলকাতায় ফিরলেই শ্বেতাদি একদিন এসে তাকে আর ছোড়দিকে নিয়ে যাবে তাঁদের কাছে।

আর বলাইবাবুর মা'ও নাকি ডেকে বলেছেন শ্বেতাদিকে—খুব ভালো লেগেছে আমার মেয়েটিকে শ্বেতা, কি নাম যেন, পারুল—ছেলেটিও বেশ, পড়াশুনোয় কেমন?

কি সাহস অরুদির। একজন পিওনের সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে দিয়ে দেবার মতলব করেছে অরুদি। মা কি সাধে চটে গিয়েছিলো, ঝুমকোদির সঙ্গে শঙ্করবাবুদের ড্রাইভারের বিয়ে হবে এ-কথা শুনে। আর মা যে-রকম, অরুদির কথামতো হয়তো ওই পিওনটার সঙ্গেই বিয়ের ঠিক করে ফেলতো ছোড়দির।

না, আর কতো ভাববে, সে আর ভাবতে পারে না। ভার ভার ঠেকে মাথাটা। পিঠের তলায় গরম মেঝেটা ভিজে গেছে ঘামে। আর মেঝের ধুলো ঘামের সঙ্গে লেপটে গেছে তার পিঠে। কি ভীষণ অস্বস্তি তার, যদি কাউকে বোঝাতে পারতো। রাগ পড়ে গিয়ে চোখে তার জল এসে যায়। প্রথম প্রথম দুয়েক ফোঁটা জল হাতের উল্টো পিঠে রগড়ে পুছে ফেলতে চেষ্টা করে। সারাদিনের ক্লান্তি, তার ওপর ঘামে কান্নায় ধুলোয় মুখটা চট চট করে।

॥ ৮ ॥

যেন আর স্বপ্ন না-দেখে আজ রাত্তিরে, এই প্রার্থনা করতে করতে সে কখন ঘুমিয়ে পড়বে। রাত একটু একটু করে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাছের জানালাটা দিয়ে বাতাস আসতে আরম্ভ করবে ঘরের মধ্যে। সেই পুরোনো স্বপ্নটা দেখে সে যেন আজ ঘুমের ঘোরে ছটফট না-করে। সেই— সে-ই যে, কারা যেন ঘরের সমস্ত দেয়ালে আর মেঝেতে লেপে দিয়ে গেছে কাগজ...আর কতো কি সব লেখা কাগজ-গুলোতে।

সে কি জানে তার প্রার্থনা সত্যি হবে না। স্বপ্ন সে দেখবেই একটা। যা-ই হোক না কেন সেটা।

রাত বাড়ছে ঠিকই অল্প-অল্প করে। খুব বেশি রাত নয়। কিন্তু তার কাছে অনেক রাত। কতো রাত তা কে জানে। একটা... দেড়টা...দুটো ?

সে কখন নিঃসাড়ে ফিরে গেছে মাঠের সেই সভায়।

লোকগুলোকে সে যেমন দেখে গিয়েছিলো, তারা ঠিক তেমনি আছে যে যা'র জায়গায়। সভা ঠিক তেমনি চলছে, কোথাও নড়চড় নেই এতোটুকু। মনুমেণ্টের গায়ে কালো-কালো ছায়াগুলো থেকে থেকে কাঁপছে। তন্ময় হয়ে সবাই বসে আছে ঠায় সেই জোর আলোটার দিকে তাকিয়ে।

মাথার ওপর একটা একটা করে যে কতো তারা উঠেছে তার ঠিক নেই। আর সেই তারা-ভরা আকাশের নিচে অসংখ্য মানুষের

কালো কালো মাথা। মনে হয়, আকাশে যতোগুলো তারা ঠিক ততোগুলো মানুষ নিচে।

যদি ঘুমে অচেতন না-হয়ে পড়তো, সে দেখতো মা আর ছোড়দি অনেক রাত করে ফিরলো পানুদের ওখান থেকে।

ছোড়দিকে বললো মা (তাকে দেখিয়ে)—রকম ছ্যাখ ছেলের। ওকে আর মানুষ করতে পারলুম না। কোথ্‌ থেকে একটা গেছোভূত আমার পেটে এসেছিলো—দেখে আয় দিকি খেয়েছে কি না—

ছোড়দি পাশের ছোট ঘরটায় চলে যায়। দেখে সকালের তৈরী-করা রুটি যেমন ঢাকা ছিলো তেমনি ঢাকা আছে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তরকারিটা গড়িয়ে গড়িয়ে চামড়ার মতো শক্ত রুটিগুলোর গায়ে মাখামাখি।

না মা, তেমনি ঢাকা পড়েই আছে।

আর কি এতো রাত্তিরে মুখে দেবে কিছু, কেন যে মরতে গেলুম—

ছোড়দি তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে যায়। আস্তে নাড়ে তার মাথাটা—

তারপর একটু উঁ করলো ও, ছোড়দি আরেকটু জোরে নাড়া দেয়।

অস্পষ্ট চোখ মেলবে। ছোড়দিকে কি চিনতে পারবে না, না মাঠেদেখা সেই মেয়েটি বলে ভুল করবে ছোড়দিকে ?

সে তো দেখছিলো এতোক্ষণ মাঠের মধ্যিখানে সমানে ঠায় বসে তার পিঠটা টনটন করছে। সে আর পারলো না। আরাম করে মাথাটা এলিয়ে দিলো পাশের এক ভদ্রলোকের কাঁধের ওপর। কিছু বললেন না ভদ্রলোক। সেও মাথাটা আরেকটু এলিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই পিঠের ব্যথাটা যায় না।

সে বুঝতে পারে না। ছোড়দির নাড়া খেয়ে পাশ ফিরছে। ডান হাতটা ভাঁজ করে সমানে মাথার নিচে রেখেছিলো সে। তার কি মনে আছে সে-কথা। ডানদিকের কাঁধটা তার বেঁকে গেছে মনে হয়। ঝিম-ধরে গেছে ডান হাতটায়। অসাড় মনে হয় হাতটা কিছুক্ষণ।

মুখটা কেমন যেন বেঁকিয়ে, জিভদিয়ে কি একটা শব্দ করে হাতটা ঘুমের ঘোরেই এগিয়ে দেয় ছোড়দির দিকে। ছোড়দি টেনে নেয় হাতটা কোলের ওপর।

(সমাপ্ত)